আলোচনা-প্রসঙ্গে

ষষ্ঠদশ খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

ষোড়শ খণ্ড

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ

প্রকাশক ঃ

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, বিহার

প্রথম প্রকাশ ঃ

তালনবমী, ১৩৯৪

মুদ্রক ঃ

শ্রীকাশীনাথ পাল
প্রিন্টিং সেণ্টার
১৮বি ভুবন ধর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১২

বাইণ্ডার ঃ

কৌশিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
১৮বি ভুবন ধর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১২

ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথনের শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস-কৃত সংকলন "আলোচনা-প্রসঙ্গে"র ষোড়শ খণ্ড পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর-এর জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত হ'ল। এই খণ্ডে ১৩ই চৈত্র, ১৩৫৫ (ইং ২৭শে মার্চ, ১৯৪৯) হ'তে ৭ই বৈশাখ, ১৩৫৬ (ইং ২০শে এপ্রিল, ১৯৪৯) পর্য্যন্ত কথোপকথন সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে মুদ্রিত অংশ ইতিপূর্বে ধারাবাহিক-ভাবে 'আলোচনা' পত্রিকার কার্ত্তিক ১৩৯৩ সংখ্যা হ'তে ভাদ্র ১৩৯৪ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

দেওঘর
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৯৪

প্রকাশক

আলোচনা-প্রসঙ্গে

১৩ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ২৭।৩।৪৯)

দুপুরে ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল বাংলোর ঘরে বিছানায় ব'সে তামাক খাচ্ছিলেন। কালীষষ্ঠীমা কাঁদছিলেন পুত্রবধূ মারা গেছে বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখন কাঁদছে। আমার খুব দুঃখ হয়। কিন্তু কী করব? আমার কথা শুনলো না। আমার কথা যেখানে যেখানে না শুনেছে, সেখানেই কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু তবু বোঝে না। এযে হবে নির্ঘাৎ জানা, ভৃগুতেও বলেছে। আমি আগে থাকতে বলেছিলাম, এই বৌ বেঁচে থাকা অবস্থায় সন্তোষের একটা বিয়ে দিতে। তাহলে তার প্রভাবে এ হয়ত বাঁচতে পারত। আমি বেশী জোর দিয়ে বলতে পারি না। পাছে আবার কী ভাবে, কিন্তু আমি কী করব? কাটান যদি কিছু থাকে, ব'লে দিলেও তা করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। যতীনদা (দাস), নরেনদা (মিত্র), কালিদাসদা (মজুমদার) প্রভৃতি ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—শিষ্যদের বাইরে প্রচারে পাঠাবার সময় যীশু তাঁদের যা' বলেছিলেন, বাইবেলের সেই কথাগুলি প'ড়ে শোনাতে।

প'ড়ে শোনানো হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রধানতঃ ঐ ১২ জনের মুন্দোতেই ক্রিশ্চিয়ানিটির এতখানি প্রসার। তাহ'লে বোঝেন কতখানি কঠোর, একনিষ্ঠ ও ভালবাসাময় হওয়া লাগে। গোড়ায় অতো কষ্ট করেছে ব'লে ক্রিশ্চিয়ানিটি আজ এত সমৃদ্ধ।

যতীনদা—আমাদের যতিদের চলন কেমন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' বলেছি তার যথাযথ ঝলক যেন আপনাদের মধ্যে পাওয়া যায়, অন্যথা যেন না হয়। আপনাদের দেখেই মানুষ কবে—এমন মানুষ দেখিনি—heavenly man (স্বর্গীয় মানুষ)।

যতীনদা—আমাদের বেশ কেমন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সহজ, সুন্দর, পবিত্র।

সীতাংশুদা (চক্রবর্তী)—বিহারের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আপনি কী বলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের আন্দোলনের ধরণটা ঠিক হ'চ্ছে না। রকমটা বিরক্তিকর হ'চ্ছে। আমরা সমাধান চাই বিপর্য্যয়ের পথে। গঠনের পথে নয়,

ভাঙ্গনের পথে। বেহারের ক্ষতি না হয়, আমরা পুষ্ট হই—এমনতর চাই। সেই ভাবে বলা লাগে। মানুষকে দিতে হয় কেমন ক'রে তাও জানি না, চাইতে হয় কেমন ক'রে তাও জানি না। মাথায়ই যেন গজায় না। নেতা হওয়ার নেশার ঝোঁকে এ সব চলছে। এক একজন এক এক ধাঁধায় ব্যস্ত। আবেদনী সুরে অকাট্য যুক্তি সহকরে এমন গভীর সহানুভূতির ভাব উস্কে দেওয়া যায় যে মানুষ পাগল হ'য়ে ওঠে। বেহারের প্রত্যেক মেয়ে পুরুষকে কাঁদায়ে দেওয়া যায়, রোখায়ে দেওয়া যায়, তখন তারাই বলবে—কাঁহে নেই দেঙ্গে ?

ইষ্টকৃষ্টিবিরোধী আন্দোলন সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকাল শ্রমিকদের দায়িত্বহীনভাবে ক্ষেপান হচ্ছে, এর ফল দেশের পক্ষে পরিণামে ভাল হবে না। সৎসঙ্গ লেবার ইউনিয়ন ক'রে তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা লাগে।...এমন অবস্থা হ'চ্ছে যে মানুষের বৌ থাকবে না, মেয়ে থাকবে না. ছেলে থাকবে না, নিজস্ব ব'লে কিছু থাকবে না, পথের কুকুরের মত, পরপদলেহীর মত অপরের দয়ায় জীবন ধারণ করতে হবে। আজকাল বলে—সব থাকবে স্টেটের হাতে, কিন্তু স্টেট যে লোকের উপর অবিচার করবে না, তারই বা ঠিক কি ? আমাদের কৃষ্টির দিক থেকে কেউ ভাবছে না। এইটেকে মেজে ঘষে যুগোপযোগী ক'রে তোলবার বুদ্ধি নেই। নীচুকে উঁচু করার বুদ্ধি নেই। উঁচুকে নীচু করার চেষ্টা চলছে। কী যে হ'চ্ছে বুঝতে পারি না, ধারণা করতে পারি না। দেখছি একটা কাণ্ড হ'চ্ছে।

১৪ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ২৮।৩।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে ব'সে কয়েকটি বাণী দিলেন। সেবা সম্বন্ধে একটি বাণী বলার পর বললেন—সেবার প্রধান জিনিষ মন। মনকে খুশী করে না, অথচ করে, সে সেবা যন্ত্রণাদায়ক। মনে হয়—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল বাংলোর ভিতর স্নান করার সময় বললেন—উপচয়ী ইষ্ট-কর্ম্মের ভিতর দিয়ে সংবর্দ্ধন হয়, যেখানে তা নেই অথচ অনুরাগ আছে ব'লে দাবী করে, সেখানে অনুরাগ নেই আছে প্রবৃত্তিপূরণী আকাঙ্ক্ষা।

কালিদাসদা—সব আকাঙ্ক্ষাই কি দোষের ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাপূরণী আকাঙ্ক্ষায় দোষ নেই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা যেখানে প্রবৃত্তিমুখী ও সত্তাবিরোধী, তাইই খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল বাংলোর পশ্চিম দিকের মাঠে এসে একখানি

চেয়ারে পশ্চিমাস্য হ'য়ে বসলেন। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম আভায় তাঁকে অপরূপ সুন্দর লাগছিল। সুশীলদা (বসু), কালিদাসদা (মজুমদার), প্রভৃতি ছিলেন। পরে পূজনীয় বড়দা এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে কতিপয় বাণী প'ড়ে শোনাতে বললেন, তা' শোনানো হলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা-প্রসঙ্গে বললেন—অনুরাগ না থাকলে আত্মনিয়ন্ত্রণী তপস্যা কষ্টসাধ্য মনে হয়। কিন্তু অনুরাগ থাকলে নিজেকে ঠিক ক'রেই ফেলে, ঠিক করতে না পারলেই বরং কষ্ট বোধ হয়।

আবার বললেন—স্থবির হ'য়ে ভগবানের কথা বলছি, কিন্তু ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবে কিছু করছি না, তার মানে অনুরাগ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দেবার পর সুশীলদা প্রসঙ্গতঃ বললেন—অহং-এর হাত থেকে ত্রাণ পাওয়া কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও একেবারে যায় না, তবে বিষদাঁত, হারা হ'য়ে থাকে।

প্রফুল্ল—মানুষ ভগবৎ পথে superior enjoyment (উন্নত আনন্দ) পেয়েও আবার কামিনী কাঞ্চনের দিকে ঝোঁকে কেন? সেটা ত আলুনি মনে হওয়া স্বাভাবিক তখন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক সময় মানুষ সংসারে baffled (ব্যর্থ) হ'য়ে হয়ত ইষ্টানুসরণ করে। তখন তপস্যা ক'রে হয়ত এমন স্তরে আসলো যখন কামিনী কাঞ্চন তা'র কাছে সহজলভ্য, তখন হয়ত সেইদিকে মন ঘুরালো। ওটা suppressed (চাপা) থাকে। সে superior enjoyment (উন্নত আনন্দ) পেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু supreme enjoyment (পরম আনন্দ) পায় নি। তাহ'লে ওদিকে আর ঝুঁকতো না। হয়ত কৃচ্ছ্রতপ করেছে। অন্য প্রত্যাশা থাকলে কৃচ্ছ্রতাবোধ থাকে। কিন্তু অনুরাগ থাকলে তা হয় না। সে supreme enjoyment (পরম আনন্দ) পায়, তা' পেলে আর সব আলুনি লাগে, যদি কিনা সত্যিকার অচ্যুত অনুরাগ হয়। এতখানি সাধনভজন ক'রে পতন হ'লে একেবারে যে নষ্ট হ'য়ে গেল, তা' নয়—"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টো হভিজয়াতে" (যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন)। অনেকের আবার অন্য আকাঙ্ক্ষা থাকলেও, প্রকৃত অনুরাগের আস্বাদন পেয়ে সে সব তুচ্ছ হ'য়ে যায়। যেমন হনুমান এসেছিল রামচন্দ্রের কাছে মন্ত্রী হবার আশায়। কিন্তু পরে রামচন্দ্রকে এমন ভাল লেগে গেল যে মন্ত্রী হবার কথা তার আর ভাল লাগত না। ভাবত —'দূর ছাই! আবার কার মন্ত্রী হ'তে যাব প্রভুকে রেখে?' সেইটেই তার

কাছে বড় হ'লো—বাজে আশা খ'সে পড়ল।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। যতীনদা (দাস), কালিদাসদা (মজুমদার) প্রভৃতি ছিলেন। বড়াল বাংলোর মধ্যে একটা জোর শব্দ হ'তেই শ্রীশ্রীঠাকুর খগেন (মণ্ডল)কে খোঁজ নিতে পাঠালেন। খগেন দেখে এসে বলল —ছাদ থেকে একটা রঙ চটাল ভেঙ্গে পড়ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারও গায় লাগে নি ত?

খগেন—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তারপর বললেন—এই যেমন শব্দটা হলো, এর সাথে সাথেই সজাগ হয়ে বোঝা উচিত ছিল—কী ব্যাপার, কিসের শব্দ, কিম্বা তখন তখনই ক্ষিপ্রভাবে যেয়ে দেখে ব্যাপারটা নির্দ্ধারণ করে যা করণীয় ক'রে ফেলা উচিত ছিল—প্রস্তুতি উদ্যমে। এতে বোধশক্তি ও কর্ম্মশক্তি আরো তীক্ষ্ণ হয়। অবশ্য তোমরা যদি আরো তীক্ষ্ণ নজরওয়ালা হতে, তাহ'লে ছাদের ঐ অবস্থা হয়ত আগেই লক্ষ্য পড়ত এবং ওটা আগেই ভেঙ্গে ফেলতে। প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়কে এইভাবে সজাগ ও সক্রিয় রাখতে হয়, নইলে শিথিল হয়ে পড়ে। ত্রুটিবিচ্যুতি ধরতে হয় আর নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, ধরতে হয় আর করতে হয়। এইভাবে কিছুদিন করতে করতে মানুষ বদলে যায়।

যতি-আশ্রমের চাউল সংগ্রহ সম্বন্ধে কথা উঠতে হরিদাসদা (সিংহ) বললেন—অন্য কাজের দরুন পারি নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত কাজই কর, সবই ত সত্তাপোষণী হওয়া চাই। পাঁচটা খুচরো কাজে জড়িয়ে পড়ে যদি একটা মুখ্য কাজ অবহেলা কর, তাহ'লে কাজগুলি কিন্তু সত্তাপোষণী হ'ল না। কাজের একটা পর্য্যায় মাথায় এঁকে নিতে হয়, আর চলতেও হয় নিরলস প্রচেষ্টায় তা'র বাস্তবীকরণে।

হরিদাসদা—কখন কোন্‌টা করণীয় তা' বুঝেও আলস্যের দরুন করা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের আলিস্যিকে যতখানি খাতির করবে, ততখানি ঠ'কে যাবে। তার মানে তুমি পারলে না, environment (পরিবেশ) তোমাকে exploit (শোষণ) করল। আলিস্যিকে কখনও প্রশ্রয় দেবে না, যা করার করে ফেলবে। ২/৫ মণ চাল যদি জোগাড় কর, তাহ'লে কতখানি মাথা ঘামাতে হবে সেজন্য। ভাবতে হবে, কোথায় কার কাছে কেমনভাবে চাইব। তার আবার কষ্ট না হয়, সেটাও দেখতে হবে। এইভাবে সেটা সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেকখানি মাথা খোলতাই হবে, বুদ্ধি খুলে যাবে। এখানকার জন্য এগুলি যদি তেমন ক'রে করতে পার, দেখবে তোমার বাড়ীর প্রয়োজন সরবরাহের প্রশ্নও কতখানি সমাধান

হয়ে গেছে। নিজের কোন দুর্ব্বলতাকেই প্রশ্রয় দেবে না। অবশ্য উত্তরসাধক থাকলে ভাল হয়। সে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। তোমরা পরস্পর প্রীতির সঙ্গে ধরিয়ে দেবে। কিন্তু নিজের ধরা ও ঠিক করাই ভাল। আর একটা কথা —একজনের কুৎসিত দোষের কথাও কেমন ক'রে তাকে বলব যাতে তার কাছে প্রীতিকর বই অপ্রীতিকর হবে না, সে উদ্দীপ্ত হবে, চেষ্টা করবে রেহাই পেতে, —সেটা আয়ত্ত করা চাই। ভাষার রকমটা কেমন হবে, উপস্থাপনাটা কেমন হবে, বোধে এনে, সেইভাবে অভ্যস্ত হওয়া লাগে।

যতীনদা—ভালবাসা না থাকলে অমন করে আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমনি ক'রে কথা বললেও আবার ভালবাসা আসে। মন যদি একাগ্র হয়, প্রাণায়াম আপনিই আসে। আবার প্রাণায়াম যদি করা যায়, তা'তেও একাগ্রতা আসে। মনকে ইষ্টবেষ্টিত রাখলে অন্যান্য জিনিসের থেকে উপরম হয়। তাকেই বলে প্রাণায়াম। ভক্তি থেকে এগুলি আপনা-আপনি আসে। আমি বিশ্লেষণ ক'রে দেখাচ্ছি, কিন্তু সমস্ত প্রবৃত্তি ছাপিয়ে যদি ভক্তি থাকে, তাহ'লে আপনি আসে। এইগুলি অভ্যাস করতে করতে আবার ওটা আসে।

কালিদাসদা—অনেক সময় আমরা একটা মানুষের বিশেষ দোষ বুঝেও তাকে বলতেই পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আমরা পরস্পরের মঙ্গল চাই না। নিজেদের ভিতরকার দোষগুলি পুষে রাখতে চাই। মানে আমার দোষের জন্যও তুমি আমাকে কিছু বলো না ; তোমার দোষের জন্যও আমি তোমাকে কিছু বলব না। আমি তাকে বললে সে অবার আমাকে বলবে এই আশঙ্কা। কিন্তু আমার ত দরকার উভয়ের ভাল যাতে হয়, তাই করা। সেই ত আমার স্বার্থ।

কালিদাসদা—আপনি ইচ্ছা করলে ত induce (আবেশ সৃষ্টি) ক'রে আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ত মাতালের কাজের মত। মাতলামি চলে গেলে করাটা বন্ধ হয়ে আসে। সে ভাবে আমি কিছু করাতে চাই না। তোমাদের mobile (চালান যায়, এমন) করতে চাই না, motile (চালাতে পারে, এমন) করতে চাই। মালগাড়ী করতে চাই না, ইঞ্জিন করতে চাই। আমি চাই তোমরা নিজেরাই এমন হয়ে ওঠ, যাতে তোমরাই আর পাঁচ জনকে চালাতে পার। অভ্যাস করলেই নিজেরাও চলতে পারবে, আর পাঁচ জনকেও চালাতে পারবে। আগ্রহ সহকারে, সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করো নিজেদের।

যতীনদা—আপনার জীবনটা যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহ'লে অনেক জিনিস

বোঝা যায়। সেই জন্যই দ্বাদশ বর্ষ গুরুগৃহবাসের কথা ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চরণ পূজো মানে চলন পূজো।

একটা মাকড়সা এসেছিল। ফেলে দেওয়া হলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর টর্চ্চ নিয়ে দেখতে বললেন চলে গেছে কিনা। কালিদাসদা বললেন—গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি আন্দাজে বললে গেছে, কিন্তু নাও যেতে পারে। আমি দেখতে বললাম practically and thoroughly determine (বাস্তবে এবং পুরোপুরি নির্দ্ধারণ) করবার জন্য। ওটা দরকার। মাকড়সাটা হয়ত তোমার কিছু ক্ষতি করবে না। কিন্তু ভাল করে দেখার অভ্যাস না থাকলে অন্য ব্যাপারে ক্ষতি হতে পারে।

আমার হওয়ায় ত হবে না। তোমাদের হওয়া লাগবে। আমি শুধু একটু ধরে ধরে দিচ্ছি।······কোথায় মুচকে হাসবে, কোথায় অট্টহাসি হাসবে, কোথায় প্রাণখোলা হাসি হাসবে, কোথায় কথা বলবে, কোথায় বলবে না, কোথায় একটু হাসিতেই হয়ে যাবে—কোথায় কার সঙ্গে কী করবে, কিভাবে চলবে তা' ঠিক করা চাই। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—নিজেকে মারতে গেলে একটা সূঁই দিয়েই মারা যায়। অন্যকে মারতে হলে ঢাল তরোয়াল লাগে।···এইগুলি কিন্তু practically (বাস্তবে) ধরে ধরে করবে। হয়ত ভুল হতে চাইবে, আবার ভাববে, আবার করবে।···চকিতে ভেবে নিলে এ ব্যাপারটার পরিণতি সু বা কু কতখানি যেতে পারে, তখনই এমন বেড়া সৃষ্টি করলে যাতে কু-র দিকে আদৌ না গড়ায়, সু-র দিকে প্রসারিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই যেভাবে টুকটাক গল্প করছি, খুঁটিনাটি ধরিয়ে দিচ্ছি, এই ভাল, না emotional (আবেগপূর্ণ) কথা বলা ভাল ?

যতীনদা—এইই ভাল।

১৫ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ২৯।৩।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। কালিদাসদা (মজুমদার), যতীনদা (দাস), নরেনদা (মিত্র) প্রভৃতি আছেন।

নরেনদা—আমাদের বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইটুকু মনে রাখলে হয় যে কোন দুর্দ্দশাগ্রস্ত বা প্রয়োজন-পীড়িত লোকের সঙ্গে আপনার যে সম্পর্ক, আপনার পরিবারবর্গের সঙ্গেও আপনার সেই

সম্পর্ক। বাড়ী গেলেই যে পাপ হবে, তা' নয়। বিশেষ প্রয়োজনে যেতে পারেন, যেমন অন্য একটা পরিবারের বিশেষ প্রয়োজনে বা কষ্টের সময় সেখানে যান। পরিবেশের আর দশটা পরিবারের সঙ্গে আপনার যে সম্পর্ক, আপনার পরিবারের সঙ্গেও আপনার সেই সম্পর্ক।

যতীনদা কথাচ্ছলে বললেন—যতি-আশ্রমের সবারই লক্ষ্য আছে যাতে এ জায়গাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, এর আবহাওয়াটা যাতে বজায় থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেক ব্যষ্টি যখন সক্রিয় ভাবে একই কেন্দ্রে কেন্দ্রায়িত হয়ে ওঠে এবং কেন্দ্রেরই পরিপূরণে প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী যা করণীয় করতে থাকে, তখন সকলেই সক্রিয় ভাবে সুকেন্দ্রিক হবার দরুন পরস্পর স্বার্থান্বিত হয়ে ওঠে, সহযোগিতা ও সেবাবিনিময়ও হয় তাদের মধ্যে স্বতঃ ও স্বাভাবিক, এইরকম করে সমষ্টি অচ্ছেদ্যভাবে মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়—সার্থক অন্বয়ে। তখনই হয় সংগঠনের সক্রিয় অভিব্যক্তি, সংগঠন আপনাআপনি চলতে থাকে। এছাড়া একতারও অন্যপথ নেই।

বহিরাগত এক ভদ্রলোক এসে বসলেন।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বরাজ স্বরাজ করে, কিন্তু সত্যিকার স্বরাজ হলে পরস্পর স্বার্থান্বিত হয়ে উঠতই। এতদিন প্রবৃত্তির উসকানি দেওয়া হয়েছে, এখন তাই প্রবৃত্তির পরিপূরণ চায়। বিবাহ-বিচ্ছেদ, প্রতিলোম বিবাহ, নিষ্ঠা-হীনতা, অসংযম, শিশ্নোদর পরায়ণ তাকেই আজ প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রবৃত্তির উপভোগ ত ক্ষণিক, তা' নিয়ে ত মানুষ ২৪ ঘণ্টা থাকতে পারে না। আমরা এমন করে ভোগ করতে চাই না যাতে আমাদের সত্তা বিপন্ন হয়। আর আমি ভাবে বিহিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাদ দিয়ে সমষ্টিস্বাতন্ত্র্য হয় কি ক'রে?'

সমষ্টিস্বাতন্ত্র্যের ধূয়োয় ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে, এর মানে কী বুঝি না।

বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে কথা উঠলো ঃ—

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিবাহটা ছিল আমাদের একটা পবিত্র সংস্কার। সেখানে স্ত্রী ছিল গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। বিবাহ-বিচ্ছেদে স্বামী স্ত্রী কারও ভাল হয় না। আজ একজনকে পছন্দ হলো না, তাকে ছাড়লাম। হয়ত একটা সন্তান আছে। আর একজনের কাছে গেলাম। তখন এই সব সন্তানগুলির না থাকবে মা, না থাকবে বাবা।

নবাগত—মেয়েদের বেঁধে রাখা ত চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেঁধে রাখা কি? মেয়ের বৈশিষ্ট্য মেয়ের মত। পুরুষের বৈশিষ্ট্য পুরুষের মত। পুরুষ সাধারণতঃ মেয়ের নিজস্ব এলাকা আক্রমণ করে নি।

মেয়েও পুরুষের এলাকা আক্রমণ করে নি। প্রত্যেকেই নিজের বৈশিষ্ট্যমত উন্নত হয়েছে। আগে কত বিদূষী ছিল—খনা, লীলাবতী, আরো কতজন। আজ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা বলছে। কারও স্বামীর অর্থ কম, রূপ কম, তাকে হয়ত বলছে—তুমি এর কাছে পড়ে আছ কেন? সেও হয়ত ভাবল—তাই তো! আগে মেয়েদের ধারণা ছিল—আমার স্বামী আমার স্বামীই, সে গরীবই হোক, ধনীই হোক, বদমেজাজীই হোক, ঠাণ্ডা প্রকৃতিরই হোক, সে আমার সত্তা, তার পরিপালন পরিপূরণ পরিরক্ষণই আমার ধর্ম্ম। স্ত্রীর সহ্য, ধৈর্য্য, ভালবাসার গুণে কত দুশ্চরিত্র স্বামীও শুধরে গেছে। স্বামীর অত্যাচার কেউই সমর্থন করে না, কিন্তু ঐ সব স্ত্রীর গুণের কি তুলনা হয়? তাদের দৌলতে পারিবারিক জীবন মানুষের কত বড় একটা শান্তির আশ্রয়স্থল ছিল। মেয়েদের উপর পুরুষরা যদি আস্থা না রাখতে পারে, নির্ভর করতে না পারে, তবে সংসার টেকে কি করে? আপনি নিজের উপর ফেলে দেখেন, আপনি যদি বাড়ী যেয়ে দেখেন—আপনার স্ত্রী মিসেস দাঁ হ'য়ে বেরিয়ে গেছে, কেমন লাগে? অবশ্য পুরুষকেও তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। সামঞ্জস্য যাতে হয়, তাই-ই করণীয়।

নবাগত—আইনগুলি ত মানুষের মঙ্গলের জন্য। নইলে এসব আইন করা হচ্ছে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা লেজকাটা শেয়াল যেমন সবগুলির লেজ কাটতে চায়, দলভারি করার জন্য, কোন কোন ক্ষেত্রে আইন করার পিছনে মুরুব্বীদের তেমনতর মতলব থাকা অসম্ভব নয়।

নবাগত—আইন হলেও সবাই খারাপ হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েপুরুষ সবার কাছে যদি প্রবৃত্তির যাজন চলে, তখন আর ঠিক থাকে কতদিন? সমাজের চাপে, শাস্ত্রের চাপে ব্যষ্টি ঠিক থাকে, কিন্তু সেইটেই যদি ধ্বংস হয়ে যায়, সেখানে ব্যক্তি তার সংযম রক্ষা করবে কতদিন?... এত করছে কিন্তু পণপ্রথার গায়ে হাত দেয় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পরপর কয়েকটি বাণী দিলেন।

রাত্রে যতি-আশ্রমে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, তুমি হয়তো কোন জায়গায় গেলে এক কাপ চা খেয়ে চলে আসলে, কিন্তু তাকে দিয়ে তোমার উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিপূরণ কী হতে পারে, তা' ভাবলে না, বা সক্রিয়ভাব তার চেষ্টাও করলে না, এটা ঠিক নয়। এতে বোঝা যায় তোমার মাথায় সেটা সুবিন্যস্ত হয়ে জাগ্রত নেই। তা' থাকলে একটা মুহূর্ত্তও নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট থাকতে

না। কাম বাগিয়ে নিতে সব অবস্থার ভিতর দিয়ে।

বাৎসরিক শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কথা উঠ্‌লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এক কাম করি। রোজ খাওয়ার আগে বাবা, মা, মেজ-বৌ, সাধনা, ভেল্কু, গোপাল, কিশোরী, অনন্ত, যতীন আচার্য্য চৌধুরী, আর আর পরলোকগত, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেকে যেন এই অন্নপানে পরিতৃপ্ত হয়ে সন্দীপ্ত হয়ে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে পরিপোষিত হয়ে স্মৃতিবাহী চেতনা লাভ করে পরমপিতা তোমারই চরণে সার্থকতা লাভ করে—এই বলে গণ্ডুষ করি।

নরেনদা—এতে কি শ্রাদ্ধের কাজ হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তেমন ভাবি।

কালিদাসদা—তা' ত থালার নীচে নামায়ে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম গুরুকে নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রসাদ হয়ে যায়, সেই প্রসাদেরই নিবেদনী পরিবেষণ করি আর সকলকে।

মোহন (ব্যানার্জ্জী)—অনেকে বলে নিজে খাব থালায়, আর পঞ্চ দেবতাকে দেব মাটিতে, সে কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাটিই ত basis (ভিত্তি), ভূমি বা রজ থেকেই ত এ শরীর। তাইই এই শরীরটা হয়েছে। তাই মাটিতে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগের সঙ্গে বললেন—কথা হলো, আপনাদের যেমন চাই তা' হয়ে উঠতে পারেন, তাহ'লে আমি খুশী হই। পরমপিতার দয়ায় তেমন হন, বেঁচেবর্ত্তে থাকুন, তাহ'লেই হয়। আপনারা হয়ে উঠুন—materialised incarnation of bliss (আনন্দের মূর্ত্ত বিগ্রহ)।

যতীনদা—নামধ্যানের জন্য প্রত্যেকের আলাদা আসন থাকা ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। বিছানা পর্য্যন্ত charged (ভাবভূত) হয়ে থাকে।

প্রফুল্ল—প্রত্যেকের aura (সূক্ষ্মপ্রভা) থাকে শুনেছি।

যতীনদা—আমরা দেখতে পারি না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চোখটোখগুলি খুব keen ও sensitive (তীব্র ও সাড়াপ্রবণ) করে তুলতে হয়, তখন দেখা যায়। সেইদিন দেখলাম মেইন লাইনের গাড়ী যাচ্ছে দূর থেকে, প্রত্যেকটা বগিই দেখা যায়।···সকালে নামধ্যান করে সবুজ দিগন্তের দিকে তাকালে চোখের দীপ্তি বেড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাণীগুলি সম্বন্ধে বললেন—Dictionary of direction (নির্দ্দেশাবলীর অভিধান) হয়ে যাবে।

১৬ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ৩০।৩।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। পূজনীয় বড়দা, যতিবৃন্দ, নির্ম্মলদা (দাশগুপ্ত) প্রভৃতি উপস্থিত। নির্ম্মলদা গিডনির জমির দলিল সম্পর্কে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিছুই চাই না। আমি চাই তোমার being (সত্তা)টা। আমার কাছে উপঢৌকন হবে তোমার perfect being (পূর্ণসত্তা)টা। অতখানি লোভী আমি। তোমার মধ্যে এতটুকু খুঁত যদি থাকে, আমি বঞ্চিত হব ততখানি। তুমি আমার সম্পদ, তুমি আমার স্বার্থ, তুমি যদি সম্বর্দ্ধিত না হও, ভাল হয়ে না দাঁড়াও, তুমি যদি এক আনা ভাঙ্গা পড়, আমিই ক্ষুণ্ণ হব, দুর্ব্বল হব ততখানি। তাই তুমি তোমার দুর্ব্বলতার সমর্থন করতে যেও না।

নির্ম্মলদা—আমার উপর পুরো কাজটার দায়িত্ব ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার মধ্যে যে শৈথিল্য আছে, তাকে বড় করে ধরছ আমার থেকে। তা' তোমাকে সুখী করবে না, সম্বর্দ্ধিত করবে না। আমার চাইতে প্রবৃত্তিকে বড় করে ধর কেন? ওরা কি তোমাকে খেতে দেবে না পরতে দেবে? আত্মবিশ্লেষণ কর না কেন? দুর্ব্বলতাকে বান্ধব করে তোমার লাভ কী? নিজেকে কখনো খাতির করো না। দুর্ব্বলতা তোমাকে কৃতজ্ঞ হতে দেবে না, তৃপ্ত হতে দেবে না, দীপ্ত হতে দেবে না। আমার লাভ তোমার being (সত্তা)। আমাকে যদি profitable (লাভবান) কর, তুমি profitable (লাভবান) হবে অজস্র।

নির্ম্মলদা জমির সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও দিয়ে আমি করব কী? আমার তোমাকে পেলে হলো।

প্যারীদা—মেয়েদের সান্নিধ্য কি পুরুষের পক্ষে ক্ষতিকর?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েরা যেন নীচেয় টানে। Gravity (অভিকর্ষ) আছে। তাই পুরুষের মন স্বভাবতঃই খানিকটা নিম্নগামী করে তোলে। পুরুষের সান্নিধ্যে মেয়েদের অবশ্য খানিকটা ভাল হতে পারে। কবীর সাহেবের কী যেন কথা আছে—

দুনিয়ামে লোগ সব বাওরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে,
দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী
পলক পলক লোহু চোষে।

অবশ্য সবাই তেমনতর নয়।

কালিদাসদা—সাংসারিক জীবনে এদের বাদ দিয়ে ত চলা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাংসারিক জীবনে চলতে গিয়ে পুরুষের খরচের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। ওঠে আবার নামে। খরচ হয়, আবার তা পূরণ করতে হয়। অবশ্য পুরুষের সংসর্গে ওরা যতটা উন্নত হয়, ততটা সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই জায়গাটা (যতি-আশ্রম) এত ভাল, এখানে মনের তরঙ্গ যেন কমে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানের সময় কাশীদা (রায়চৌধুরী)কে বললেন—তাড়াতাড়ি দশটা টাকা সংগ্রহ করে এনে মঙ্গলাকে দে।

কাশীদা একটু পরেই দশটা টাকা নিয়ে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কোথার থেকে আনলি ?

কাশীদা—আমার কাছে আর একটা তফিলের টাকা ছিল। তা থেকে এনেছি। পরে ঠিক করে রাখব।

এই বলে কাশীদা মঙ্গলা মাকে টাকা দিতে যাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাহলে হলো না। ও দিস্ না। এতে তোর অতখানি মানসিক বিচ্যুতি এসে যাবে।

কাশীদা—আমি এখনই সংগ্রহ করে দিচ্ছি।

ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি বড়াল বাংলোর ঘরে তক্তপোষে বসেছেন। স্মৃতিবাহী চেতনা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আগে পশ্চাদ পসারিণী চিন্তা করবার অভ্যাস ছিল, কিন্তু পরে মনে হতো এই আছি, এই নাই—

এক লহমা সময় আছে
সর্ব্বনাশের মাঝখানে তোর,
ভোগ সায়রে ডুব দিয়ে হ'
একটানে সে নেশায় ভোর।

অতো সবে কী হবে ? তাঁকে নিয়ে থাকলেই হলো। মার জন্যই ছিল সব। মা গিয়ে আমার হাতের লাঠি যেন হারিয়ে গেল।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা)—একটা মানুষ ত বিশ্বযন্ত্রের একটা অংশমাত্র, তার মূল্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

১৭ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ৩১।৩।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায়। যতীনদা (দাস), কালিদাসদা (মজুমদার), প্রফুল্ল প্রভৃতি উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম হচ্ছে না মনে মনে ?

কালিদাসদা—মাঝে মাঝে হয় আবার মাঝে মাঝে কেটে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যাস করতে করতে হবে। নাম যদি সব সময় করা যায়, মাথাও সাফ থাকে, ঠিক থাকে। শরীরেও একটা glow (দীপ্তি) হয়। চোখটোখগুলি যেন সার্চ্চলাইটের মত হয়। মানুষও তা দেখে আকৃষ্ট হয়।

মুক্তাগাছার জনৈক দাদার সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে কিছু হবে না, তোমার বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গা মানে তোমাকে হারান। ধর্ম্ম চাই গোড়ায়, সতীত্ব ঠিক রাখা লাগবে, সবর্ণ ও অনুলোম বিবাহ ঠিকমত চালাতে হবে। পারিবারিক যন্ত্র, পারিবারিক শিল্প যত বাড়ে ততই ভাল, অবশ্য প্রয়োজনীয় মহাযন্ত্র ছাড়া মহাযন্ত্র বেশী না রাখা ভাল। টাকা আক্রা ক'রে ফেলা লাগে, জিনিসকে সস্তা ক'রে তোলা লাগে। টাকা কম হাতে থাকলে জিনিসের যেন অভাব না থাকে, উৎপাদন বাড়িয়ে দিতে হয়। জিনিসের অভাব না থাকলে অসন্তোষ কম থাকে। বর্ণ অনুপাতিক শ্রম ভাগ করা লাগে, তাদের পারস্পরিকভাবে স্বার্থান্বিত করতে হয়, ভারত ও পাকিস্তান যেন পরস্পর বান্ধবের মত চলে, তাতে উভয়েরই মঙ্গল। সেইভাবের প্রচার চালাতে হয়।

নির্ম্মলদা (দাশগুপ্ত)—চেষ্টা সত্ত্বেও অসাফল্য আসে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখতে হয় নিজের ত্রুটি কোথায়। নিজে ভাল হতে চাইলেই ভাল হওয়া যায়। নিজেকে নিজে না শোধরালে কেউ ক'রে দিতে পারে না। নিজেকে শায়েস্তা করে ফেল, শায়েস্তা হয়ে যাবে সব। নইলে নিজেকে মারলাম দশজনকেও মারলাম। নিজের glow (দীপ্তি) না বাড়ালে, মানুষকে glow (দীপ্তি) দেবে কি করে ? যারা সমর্থ ও সক্ষম, যারা পারে, তারাই দুনিয়াতে টিকে থাকে। Survival of the fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন)-এর মানে সক্ষম অক্ষমকে ধরে খাবে, তা' কিন্তু নয়। দুনিয়ার বুকে টিকতে গেলে দক্ষতা চাই এই কথা।

১৮ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৫৫ (ইং ১।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায়। নরেনদা (মিত্র), কালিদাসদা (মজুমদারদা) প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন হচ্ছে ?

কালিদাসদা—নামধ্যানে আজকাল মন বসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিয়ন্ত্রণ কেমন হচ্ছে ? বিষাক্ত ব্যবহার সহ্য করতে পার কেমন ? এ গুলি কিন্তু test (পরীক্ষা) করা লাগে। একজন হয়ত ইচ্ছা করেই আর একজনকে বিষাক্ত কথা বলল, সে অবস্থায় কেমন হজম করতে পারে, তা দেখে অনেকখানি বোঝা যায়। হিন্দীতে বলে নিরখপরখের কথা। আমি বলি আত্মবিশ্লেষণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ।

নরেনদা—আমার চাইতে দুর্ব্বল যে সে যদি আমাকে লাখ অপমানও করে, তা আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু সমান বা উঁচু বলে যাকে মনে করি, তার এতটুকু কথাও সহ্য করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা হীনম্মন্যতা।

নরেনদা—যায় কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওত একটা মনের ভাব—complex (প্রবৃত্তি)। তাকে প্রশ্রয় না দিলেই হয়। ওটা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় সহজেই। একবার ধরে ফেললে ছাড়ার ইচ্ছা থাকলে ছাড়তে বেশী দেরী লাগে না।

যতীনদা (দাস) আসলেন।

একটু বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনারা adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হলে যে বাঁচি, একটু consoled (আশ্বস্ত) হতে পারি। চাই নিরখপরখ। ঠিক করা লাগবে। এমন হওয়া লাগবে যেন angel (দেবতা) উঠে পড়ে লাগলেই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বিশেষ একটি বাণী পড়তে বললেন। পড়া হলো—

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হও
তপ-প্রাণ হও,
সংবুদ্ধ হও,
বীর্য্যবান হও,
অক্লান্ত তেজীয়ান পরিশ্রমী হও,
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যায় নিরাশী হও,
নির্ম্মম হয়ে ওঠ তাতে,
নিরখপরখ কর নিজেকে,
আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণে
অন্তরকে সব সময় ঝকঝকে করে রাখ,
কৌশলী ও তীক্ষ্ণধী হও,

সদাচারে শরীর ও সত্তাচর্য্যী হও,
সৎ ও সুভাষী হও,
প্রীতি, সৌজন্য, সেবা ও সহযোগিতায়
সবারই সম্বর্দ্ধনী করে তোল নিজেকে,
কলঙ্ক, দ্বন্দ্ব ও দুর্ব্বলতাকে তিরোহিত করে,
অন্যায় ও অসৎ যা, তাকে নিরোধ করে,
আলোকে উল্লসিত থাক
এবং করে তোল সকলকে,
আর সব কিছু নিয়ে
প্রিয়পরমে সার্থক হয়ে ওঠ ;
—এই হচ্ছে
যা কিছু সবেরই পরম সার্থকতা।

বাণীটি পড়া হলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজেদের adjust (নিয়ন্ত্রণ) করে ঠিক ঐ রকম হওয়া লাগবে, ছাকা ঐ জিনিস চাই। নিজেকে কখনও ছাড়বেন না, কোন দোষকে সূচ্যগ্র স্থানও দেবেন না।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাড়ীতে মেয়েছেলেরা যদি ভাল না হয় তাহলে বোধ হয় পুরুষদের will to ugliness (কদর্য্যতার প্রতি ইচ্ছা) হয়।

সাধনা-প্রসঙ্গে বললেন—নামের সঙ্গে ধ্যান চাই, ধ্যানের সঙ্গে অনুরাগ চাই, অনুরাগের সঙ্গে চাই চরিত্র নিয়ন্ত্রণ। ভাবের উচ্ছ্বাস হলো অথচ তাকে যদি সচেতনভাবে ভাল দিকে না লাগিয়ে খারাপ দিকে ঝুঁকি, তবে অতখানি বেগে খারাপের দিকে এগিয়ে যাব। তাই সে অবস্থায় মন যাতে ইষ্ট বই প্রবৃত্তির দিকে না ঝোঁকে, সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হতে হবে। নচেৎ ওর ফলে পতনও হতে পারে দ্রুত ও গুরুতর।

সুশীলদা (বসু)—নাম করতে বসে যদি দুর্নিবার কামচিন্তা আসে, কী করণীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমন হলে তখন উঠে পড়ে অন্যভাবে ব্যাপৃত হওয়া ভাল। অনেক সময় বাদ দেওয়ার চেষ্টায় আরো ঠেসে ধরে।

প্রফুল্ল—আপনার দেওয়া স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি নীতি অপূর্ব্ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐগুলি যে পালন করে তার বেঘোরে পড়া মুস্কিল।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি অস্তিত্ব, জীবন বা সত্তাকে ধরেই ঈশ্বর বা ব্রহ্মের দিকে গিয়েছি। কোন আন্দাজী বা অলীক জিনিসের উপর দাঁড়াই নি। এটা বুঝতে মানুষের অসুবিধা হবার কথা নয়।

১৯শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ২।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

প্যারীদা (নন্দী) জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেমেয়েদের উপর মানুষের এত টান হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেমেয়ের উপর টান বেশী হয়ই। সেটা স্বাভাবিক। কারণ, সত্তা থেকেই তারা সৃষ্ট। ঐ টান আবার ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে অন্যের ছেলে-পেলের উপর। টানটা sublimated (ভূমায়িত) হয়। নিজেরটার দাঁড়ায় বোধ করা যায় অন্যের সন্তানকেও।

প্রফুল্ল—শ্রেষ্ঠে সুকেন্দ্রিক না হ'লে কি ঐভাবে ভূমায়িত হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানেই হোক ভালবাসা একাগ্র হ'তে-হ'তে এমন একটা মোক্ষম পর্য্যায়ে আসে, যখন ভূমায়িত হ'তে শুরু করে। একাগ্রতা যত বেশী হয় ভূমায়িতও হয় তত। শ্রেয়ে আনতি না থাকলে অনেক সময় ঐ বৃত্তিটারই ব্যাপ্তি হয়। তার মধ্যে শ্রেয়কে প্রীত করার উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে।

সত্যদা (দে) আসলেন।

তিনি প্রণাম ক'রে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—প্রমথদা গিয়ে আমি হাড়ভাঙ্গা হ'য়ে গেছি। আমি কতদিন আগে থেকে বুঝেই সাবধান হ'তে ব'লেছি। স্কট্‌স্ ইমাল্‌সন ইত্যাদি ঠিকমত খেতে বলেছি, কিন্তু ঠিকমত খেতই না। কি করব ? বেহাতি। আমার কথামত যদি কেউ চলে, করে, সেখানে হাত থাকে, কিন্তু কথা শুনে না চললে সেখানে আমার হাত কোথায় ? আমি কত ক'রে ওষুধ খাবার কথা বলেছি, কিন্তু খেত না।

সত্যদা—সন্ন্যাসী ও যতিতে তফাৎ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতি মানে সক্রিয় ভক্ত ও জ্ঞানী, তবে এই জ্ঞান লাভ করতে হয় হাতে-কলমে করার ভিতর দিয়ে। সন্ন্যাসী মানে সম্যকভাবে আত্মনিবেদিত যে। যতিই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস আপনা থেকে আসে। যতির মধ্যে আছে প্রত্যর্পণ। যেখান থেকে এসেছি, সেখান থেকে আলগা ছিলাম, সেখানে আবার নিজেকে ফিরিয়ে দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলাম সেই পথে চলতে। নিজের দুর্ব্বলতাকে উপেক্ষা ক'রে তাঁরই হ'তে থাকলাম সর্ব্বতোভাবে।

সত্যদা—সন্ন্যাসী তো বিয়ে করতে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব।

সত্যদা—আজকালকার বড়-বড় মনোবিজ্ঞানীরা ভগবান ও ধর্ম্ম মানে না কেন ? তারা তো অতো জ্ঞানী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—unadjusted Knowledge (অনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান)।

সত্যদা—Adjustment (নিয়ন্ত্রণ)-এর কথাই তো বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Adjust (নিয়ন্ত্রণ) করবে কি দিয়ে ? চিনিকে যদি মিছরির দানায় পরিণত করতে চাও তবে চিনির বাইরের একটা সূতো চাইই, নচেৎ দানা বাঁধবে কিসে ? ঐ সূতো যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ দানাত্ব। ইষ্ট ও কৃষ্টিই হ'লো ঐ সূতো।

সত্যদা—বৌদ্ধধর্ম্ম তো কতকগুলি নীতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে আছে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামিং, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। ও বাদ দিয়ে হবে না। যেখানে সেখানে যাওরে মাকু, চরকি ছাড়া নয়। ধর্ম্ম কখনো বহু হ'তে পারে না, দ্বিজাধিকরণ আলাদা হ'তে পারে। মূল জিনিস হ'লো পঞ্চবর্হি। 'একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্। পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধা ঋষয়ঃ শরণং। তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্। সত্তানুগুণাঃ বর্ণাশ্রমাঃ শরণম। পূর্ব্বা পূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্।' ঐ লাইনে নিয়ন্ত্রণ করা লাগবে সব। ওটা সাধারণ সূত্র। ওর মধ্যে দিয়েই ঐক্য সম্ভব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যদাকে বললেন—তুই একটা ভাল কাজ গুছিয়ে নে।

সত্যদা—আপনার দয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর দয়া অসম্ভব। তাঁর দয়া কি আমরা নিই ? ফিরিয়ে দিই। অন্যভাবে ভ'রে রাখি নিজেদের আধার। দয়া রাখার জায়গা আর খালি রাখি না।

২০শে চৈত্র, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ৩।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে মাটির দাওয়ায় পাটির উপর উপবিষ্ট।

সত্যদা (দে) প্রসঙ্গত বললেন—নারী পুরুষ সমান—এই কথাটা রাজনীতিতে খুব চালু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাস্তবতার সঙ্গে যে রাজনীতির সম্পর্ক নেই, সে আবার কিসের রাজনীতি ? নারীপুরুষ উভয়েরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদা, কালিদাসদা, নরেনদা (মিত্র) প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করলেন—সর্ব্বদা নাম চলছে তো ?

প্রত্যেকে নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকের অভ্যাস আছে শিস দিতে দিতে কাম করে। ঐ রকম

অভ্যাস করলেই হয়। ঘুমের মধ্যে পর্য্যন্ত নাম চলে। সমস্ত কাজের মধ্যে নাম করা খুব ভাল জিনিস। আমার ব্রাহ্ম এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি সব সময় হরিনাম করতেন। ঘুমের মধ্যে পর্য্যন্ত নাম হ'তো। আমি তাঁর অনুভূতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। দুই-একটা কথা ছাড়া বলতে পারলেন না। তাও তাঁর কাছে miracle (সিদ্ধাই) গোছের। নাম-টাম আবার concentric (সুকেন্দ্রিক) না হ'লে effective (কার্য্যকরী) হয় না। পরিশ্রমই সার হয়। যখন সব অবস্থায় নাম normally (সহজভাবে) হয়, এমনকি ঘুমের মধ্যেও নাম চলতে থাকে, তখনই ভজন নেবার সময়।

জনৈক দাদা—শব্দ না জাগলে নাকি ভজন দেওয়া হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ অবস্থায় শব্দ জাগেই। নাম করতে করতে এমন হয় যে তার শরীরের স্পর্শে অপরে Electric spark (তড়িৎ ঝলক)-এর মত বোধ করে। যাকে স্পর্শ করে তার চোখটোখ দিয়ে তা আবার ঠিকরে বেরোয়। সে চোখে সরষের ফুলের মত দেখে। মহারাজের স্পর্শে অন্যের অমনটা হ'ত। নাম বলতে আমি বলছি অনুরাগ-সম্বলিত নাম। অচ্যুত অনুরাগ। কেষ্ট ঠাকুরের গুরুদেব তাঁকে বলতেন—'অচ্যুতো ভব'। ঐটেই মূল খুঁটি, ওটা শক্ত থাকা দরকার। অনুরাগ থাকলে normally concentric (স্বাভাবিক ভাবে সুকেন্দ্রিক) হয়। যা কিছু করে with centre (কেন্দ্র সহ)।

নরেনদা—শ্রীকৃষ্ণ কি ১০-১২ বছর বয়সে বোধ করতে পারতেন, তিনি কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Normal (স্বাভাবিক) হয়ে তাঁর মধ্যে ছিল সব। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সব বোধ হতে লাগল। Environment (পরিবেশ)-এর সঙ্গে contact-এ (সংস্পর্শে) ও contrast-এ (বৈপরীত্যে) নিজেকে feel (বোধ) করতে লাগলেন। তাঁর এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তফাৎ এই যে, তিনি সব জানেন, অন্যরা জানে না। অনেক জিনিস যা আমি কই-টই তা জ্ঞান বলে বুঝতাম না, এর যে একটা দাম আছে, তা' ম'নে হ'তো না। মনে হ'তো, সবাই বুঝি এমনটা বোঝে, জানে, বোধ করে। পরে দেখলাম ব্যাপারটা তা নয়।

জনৈক দাদা—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনিই ওষুধ—সেটা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাপোষণী যা-কিছু সবই তিনি। নাম করলেও অসুখ সারে। নামের গভীরতা যত বাড়ে, আরোগ্যশক্তিও তত বাড়ে। নামে শরীরের ও মনের নানাজাতীয় পরিবর্তন ও বিকাশ হয়। সেগুলি আবার হয় সহজ ও স্বাভাবিক।

নরেনদা—কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম করতে করতে মেরুদণ্ডের ভিতরকার তরল পদার্থের মধ্যে

আলোড়নের দরুন মেরুদণ্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রে যে সব বোধ হয়, তাকে বলে ঐভাবে। সাপের সঙ্গে অনেক সময় তুলনা করে।

যতীনদা—নাম করতে-করতে অনেক সময় যে প্রবৃত্তি জাগে সে কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম করতে-করতে মেরুদণ্ডের তরল পদার্থের মধ্যে যে চাঞ্চল্য হয় তার ভিতরের বিশেষ এক ধরনের অনুকম্পনের দরুন কখনও কখনও যৌন উত্তেজনা দেখা দেয়। অবশ্য তার মোড় ইষ্টের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হয়। আবার এমন অবস্থাও হয় যে কিছুতেই ঐ সব ভাব জাগে না। মেয়েরা নামটাম বেশী করলে, তাদের চেহারায় একটা অপূর্ব্ব লালিত্য ফুটে ওঠে। সে লালিত্য দেখে কিন্তু কামভাব জাগে না, শ্রদ্ধা হয়।

২১শে চৈত্র, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ৪।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে বসে পর পর বাণী দিচ্ছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর যতিদের বললেন—আপনাদের হয় না, তার কারণ diversion (গতি পরিবর্ত্তন) হয়। তাই বৈধানিক বিন্যাস হয় না। হওয়া লাগবে, করা লাগবে অচ্যুতভাবে সব কাজের ভিতর দিয়ে ক্রমাগতি নিয়ে, তবেই বৈধানিক বিন্যাস তেমনতর হবে ক্রমশঃ আর ওটা বজায় রেখে চললেপরে পুরুষ পরম্পরায় বেড়ে চলে।

কাশীদা (রায়চৌধুরী)—বৈশিষ্ট্য বলতে কি বুঝব ? আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার বৈশ্য কাজ অর্থাৎ ব্যবসায়ে ঝোঁক সে কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার বৈশিষ্ট্য যা, তাতে তুমি একটা অনাবিল সুখ পাও। টাকার প্রলোভনে ব্যবসা করতে পার, টাকাও পেতে পার, কিন্তু তাতে তুমি সুখ পাবে না। বৈশিষ্ট্য বা সংস্কার বোঝা যায় অভ্যাস, ব্যবহার দেখে। তুমি কথা বল কেমন ক'রে, বস কেমন ক'রে, বাহ্যিপ্রস্রাব কেমন ক'রে কর, এ সব দেখে বোঝা যায়।

কাশীদা—সে ত দলের মধ্যে পড়ে পরিবেশের দরুন হ'তে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—দলের মধ্যে হলেও গোলাপফুল জবাফুল হবে না। তা সে লাখ জবাফুলের মধ্যেই থাক না কেন। আবার জবাফুলও গোলাপফুল হবে না;

মেণ্টু (বসু)—আমাদের টান একটার থেকে গিয়ে আর একটার উপর পড়ে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যার দ্বারা যেখানে যেমন উদ্দীপ্ত হয় উপভোগের টানও সেখানে তেমন ঘুরে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাতে যতি-আশ্রমে যতিদের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে বললেন—লোককে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোথাও ধমক দেওয়া লাগে, কোথাও মিষ্টি কথা বলা লাগে, কোথাও বিন্যস্ত করা লাগে। দেখেন না কতসময় অন্য লোককে লাগিয়ে দিই, একে এ বলি, ওকে তা' বলি।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—মহারাজ যখন মারা গেল, আমি হতাশ হ'য়ে এসে মার কাছে পড়লাম, মা এমনভাবে কয়েকটা কথা বললেন যে তা'তে আমার মন ঠিক হ'য়ে গেল। মা মারা যাবার পর খেপু তখন আমাকে ঐভাবে আগলে ধরেছিল। সে ব্যথা যায়নি, মাকে পাইনি, কিন্তু sink করে (ডুবে) যাচ্ছিলাম, তা থেকে বাঁচলাম। Urge (আকুতি)টা পেলাম না, কিন্তু existence (অস্তিত্ব)টা এখনও আছে।

জনৈক দাদা—আমাদের চালচলন কেমন হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চলাফেরা খুব ক্ষিপ্র হবে, সেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা, চাল-চলন সবটার মধ্যে একটা স্থৈর্য্য ও মিষ্টতা থাকা চাই।

২২শে চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (ইং ৫।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার) প্রভৃতির সঙ্গে কবিত্বপ্রতিভা সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাল মুনি না হ'লে ভাল কবি হয় না। মুনি আর ঋষিতে তফাৎ এই যে মুনি মনন নিয়ে থাকেন। কিন্তু ঋষি practical (বাস্তব) করার মধ্য দিয়ে জানেন। তাই practical realisation (বাস্তব অনুভূতি) না থাকার দরুন মুনি বা কবির বিভিন্ন কথার ভিতর হয়ত বা সূক্ষ্ম অসঙ্গতি থাকতে পারে, কারণ সেখানে তখনও প্রবৃত্তির উন্মোচনা থাকা সম্ভব।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অজানাকে জানার আগ্রহ থেকেই মানুষ বিবর্ত্তিত হ'য়ে চলে।

যতীনদা পাশে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যতীনদা নামটাম করছে খুব। স্নায়ুগুলি তরতরে আছে। এখন থেকে যদি সুভাষী না হয়, তবে দুর্ব্বাসার মত হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে।

নামধ্যান সম্পর্কে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব কাজের মধ্য দিয়ে সর্ব্বদা নাম চালাবার বুদ্ধি ছিল আমার।

তাছাড়া যখনই ফাঁক পেতাম, নামধ্যান ও ভজন করতাম। কোন সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হয়ত ধ্যানে ডুবে যেতাম। আর উষা-নিশায় ত করতামই। ধুঁধুঁ হয়ে যেতাম। নাম করতে করতে চলেছি হয়ত বেতবনের মধ্যে ঢুকে গেলাম। নাক বরাবর যেতে যেতে হয়ত পটলক্ষেতেই উপস্থিত হলাম। বাইরের দিকে খেয়ালই থাকত না। নামের নেশা পেয়ে ব'সে থাকত।

শরৎদা—প্রকৃত ধ্যান কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধ্যান মানে ইষ্টসম্বন্ধীয় চিন্তা, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার্থে কি করব, কেমন করে করব, কি ভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করব, কোন্ চলনে চলব ইত্যাদি চিন্তা। মন ত নিশ্চল থাকে না, মনন চলেই। সর্ব্বপ্রকারের মনন যখন ইষ্টার্থী ও ইষ্টানুগ হয়, তাকেই বলে প্রকৃত ধ্যান। এইই হ'লো একাগ্রতা। একাগ্রতা মানে নিথর অবস্থা নয়। নিষ্ঠানন্দিত একমুখী চিন্তা, চলনই একাগ্রতা। আরো একটা জিনিস মনে রাখবেন, যজন যেমন নিত্যকর্ম্ম, যাজনও তেমনি নিত্যকর্ম্ম। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা নয়। আর ইষ্টভৃতি হ'লো ইষ্টপ্রাণতার Spine অর্থাৎ মেরুদণ্ড।

প্রফুল্ল—মেয়েদের কি ভিক্ষা করা ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও ভাল না আপদ্ধর্ম্ম ছাড়া। কিন্তু গৃহস্থালির ভিতর দিয়ে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কিছু কিছু উপার্জ্জন করবার শিক্ষা ও অভ্যাস তাদের থাকা উচিত। এটা না থাকলে ছেলেপেলের মধ্যে অর্জ্জনপটুত্ব গজায় কম। তাছাড়া, পরিবারের অভাব-অসুবিধার সময়ও, তা' অতিক্রম করার বুদ্ধি তাদের মাথায় খেলে না। আজেবাজে ও উদ্বৃত্ত জিনিস যা ফেলে দেওয়া বা নষ্ট করা হয়, তার লাভজনক সদ্ব্যবহার কিভাবে করতে হয়, তা'ও তাদের জানা দরকার। এইভাবে যারা চলতে জানে, তাদের সংসারে অভাব-অনটন কমই হয়। সুশৃঙ্খলভাবে সংসার করতে শেখা মেয়েদের শিক্ষার একটা অঙ্গ। সুগৃহিণীদের সাহচর্য্যে পারিবারিক পরিবেশে এই শিক্ষা সঞ্চারিত হয়।

পরে বললেন—নাম করার এমন অভ্যাস ক'রে ফেলতে হয়, যেন সর্ব্বক্ষণ চলে। কথা বলছেন, তারপর হয়ত দেখলেন আবার নাম শুরু হ'লো, তার মানে কথার মধ্যেও নাম ছিল। ঘুম থেকে উঠে দেখলেন নাম হচ্ছে, তার মানে ঘুমের মধ্যেও হচ্ছিল। ঘুমের মধ্যেও নাম চলছে, তা ঠিক পাওয়া যায়।

আর একটা কথা—মেয়েদের একটা নিম্নাভিমুখী টান আছে। মাটির গুণ আছে তাদের মধ্যে। তারা পুরুষকে টেনে নামায়। তাদের থেকে যথাসম্ভব aloof (আলগা) থাকা লাগে। তাদের সঙ্গে সংস্রবের প্রয়োজন বাড়াতে

নাই। রামকৃষ্ণ ঠাকুর একথা নানাভাবে বলে গেছেন।

একটু বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খেতে বসতে হয় ফাঁক-ফাঁক হয়ে। খুব ঘন-ঘন বসলে আমার মনে হয় লালা নিঃসরণ ভাল হয় না। কারণ, অন্যদিকে মন চলে যায়, হজমও ভাল হয় না ওতে। একলা-একলা বসলে সব থেকে ভাল হয়।

শরৎদা—'সবল যদি রতি ছাড়ে মেহজন্মে, মেদ বাড়ে' একথাটা কি ঠিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামের চোটে মেদ বাড়া দূরে থাক্, শুকিয়ে যায়। শরীর সুস্থ ও সবল হয়। তপস্যাপূত সুস্থতা ও সবলতা আসে। ওটা হয়ত জোর করে অবদমন করে চলে যারা, উন্নত চিন্তা নেই যাদের, তাদের সম্বন্ধে বলা।

শরৎদা—যা যা করেছেন বা করছেন আপনি, তা কি ঠিক ছিল ? কোন plan (পরিকল্পনা) ছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিকঠাক কিছু ছিল না। কোন plan (পরিকল্পনা)ই ছিল না, কিছুই ছিল না। সবার ভাল যাতে হয়, তা' করতে হবে, তাই আমার কাম ক'রে গিয়েছি। অবস্থা ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে।

যতীনদা—আপনার জানা ছিল না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার জানাটানা কি ? ভাবিই নি ওভাবে। যখন যা করবার পরমপিতা করিয়ে নিয়েছেন, নিচ্ছেন ও নেবেন। ব্যাপারটা তাঁর, আমি আধার মাত্র।

পরে কথা-প্রসঙ্গে বললেন—আমার সমস্ত বলার মধ্যে কর্ম্মের উপর জোর দেওয়া আছে—কর, হও, পাও।

শরৎদা—আপনার বলা আছে—নিজপ্রবৃত্তি-আকাঙ্ক্ষা পূরণের টানের চাইতে ইষ্টে বেশী টান না থাকলে অদৃষ্ট বা কর্ম্মফলের বিরুদ্ধে কৃতকার্য হওয়া যায় না। এর তাৎপর্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টে ঐ ধরনের টান হ'লে প্রবৃত্তিগুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হবে, ভুল হবে কম, নচেৎ সত্তা যাবে প্রবৃত্তির কোলে, আর চলনও হবে তেমনতর। তাই কর্ম্মফল দুর্নিবার হয়ে উঠবে।

শরৎদা—আমাদের চেষ্টাগুলি নিরন্তর হয় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের মনই ত চঞ্চল ও দোলায়মান, তা বৃত্তিঘূর্ণিতে ঘুরতে থাকে চারদিক। এর থেকে নিস্তার পেতে গেলে চাই গভীর ইষ্টকেন্দ্রিকতা।

শরৎদা—সৎনাম মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাসম্বর্দ্ধনী সদ্গুরু প্রদত্ত নামই সৎনাম। দুনিয়ায় যা-কিছু সবই স্পন্দনের অভিব্যক্তি, সৎনামের মধ্যে থাকে স্পন্দনের মরকোচ। তাই, নামীর

প্রতি অনুরাগ নিয়ে যে নামের মূলে উপনীত হয়, তার ভিতর সর্ব্বজ্ঞতার স্ফূরণ হয়।

শরৎদা—আপনার কথাগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বিজ্ঞান জানি না, কইতেও যাই নি। বাস্তব ব্যাপারগুলি বলে গেছি। যা দেখেছি, বোধ করেছি, তাই বলেছি ও বলি।

২৩শে চৈত্র, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ৬।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

কাশীদা (রায়চৌধুরী) জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষ যে নিজেকে অসহায় মনে করে, তার জন্য দায়ী কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রধানতঃ নিজে। ইষ্ট ও পরিবেশের জন্য যার করা যতখানি থাকে, ততখানি সে বিশ্বাস ও মনোবলের অধিকারী হয়। পরমপিতার দয়ার অন্ত নেই, মানুষ যতই তাঁকে ভালবাসে, সে ততই সে-সম্বন্ধে সচেতন হয়।

প্রফুল্ল—মানুষ যতই যা করুক, তাঁর দয়া না হলে কিছুই হবার নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এক বুদ্ধি, তিনি দয়া করলেও আমি তাঁকে চাই, তিনি দয়া না করলেও আমি তাঁকে চাই। আমার চাওয়াটা যদি সত্যিই এমন হয় যে তাঁকে না হলে আমার চলবে না, তাহলে যেমন হতে হয়, তেমন হয়ে উঠব আমি। আমি যদি না চাই তবে তিনি দয়া করলেও তা আমার বোধগম্য হবে না।

শরৎদা—বিড়ালছানা ও বানরছানার কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যদি বিড়ালছানার মত হয়, বিড়ালে এসে কোনসময় নিয়ে যাবে তাকে, নচেৎ শুকিয়ে মরে যাবে সেখানে। কিন্তু তাতেও তার দুঃখ নাই। সে tired (ক্লান্ত) হয় না, বিরক্ত হয় না। শবরী যেমন ছিল। তাঁকে ছাড়া তার উপায় নেই। সে যে গত্যন্তরবিহীন। তার সত্তা কী নিয়ে থাকবে ? অন্য জিনিসে আসক্তিতে বা তাঁতে বিরক্তিতে তার সমূহ ক্ষতি, মহতী বিনষ্টি। এই বুঝ তার চরম, আর এইই ত মোক্ষম জ্ঞান। অন্ততঃ সত্তার অভিপ্রায়টা ঐ ধাঁচের হলেও বাঁচোয়া।

জন্মান্তরীণ স্মৃতিটা একটুখানি না থাকলে বোধহয় ঐ জ্ঞান টনটনে থাকে না। জন্ম-জন্মান্তরীণ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার রেশটুকুও যদি মাথায় থাকে, তাহলে মানুষ বুঝতে পারে যে একমাত্র তিনি ছাড়া জগতের কিছুতেই সুখ নেই।

চলার ঐ একমাত্র পথ। তাই যত অসুবিধাই হোক, চলতেই হবে তাঁর পথে,

পেতে হবে তাঁকে। আর সব পথ যে রুদ্ধ। তাই, অবসন্ন বা অসহিষ্ণু হয়ে লাভ কী ?

হাউজারম্যানদা—বর্ণবিধান যেখানে নেই,সেখানে বিয়ে কিভাবে দিতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখতে হয় ছেলে ও মেয়ের পারিবারিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি সঙ্গতিশীল কিনা। মেয়ে এমনতর হওয়া উচিত যে কিনা পুরুষের বংশগত ও ব্যক্তিগত সংস্কার ও বৈশিষ্ট্যকে মূর্ত্ত করে তুলতে পারে। প্রতিলোম ও অসমীচীন বিবাহপ্রসূত সন্তান বাবা ও মা কারও ভালটা পায় না। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বৈশিষ্ট্যই বিধ্বস্ত হয় এতে। মাটি যদি বীজের অনুকূল না হয়, তাহলে গোলমাল হয়। একদেশে মাটির ফলে যে কমলা মিষ্টি হয়, তার বীচি অন্য মাটিতে পোতার ফলে হয়ত কমলা টক হয়ে যায়। তার কারণ মাটি বীজকে proper nurture (বিহিত পোষণ) দিতে পারে না কিংবা ঐ বীজের অন্তর্নিহিত কোন কোন গুণ নষ্ট করে দেয়। উন্নত জাতের গরু ও নিকৃষ্ট জাতের ষাঁড়ের মিলনের ফলে বাচ্চা খারাপই হয়। প্রতিলোম-সংযোগে কখনও ভাল হতে পারে না।

হাউজারম্যানদা—মানুষ ত এটা বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবাই বুঝবে না। কতকগুলি ভাল লোককে বোঝাতে হয়। তাদের দেখে অন্যে সশ্রদ্ধ হয়ে আকৃষ্ট হবে। আদর্শের প্রতিষ্ঠা হলো প্রধান কাজ। ঐটে হলে ভাল কথা সহজে মাথায় ধরে। বাইবেলে ভগবান যীশু কত কথা বলেছেন। কিন্তু নানাভাবে একটা কথাই বলেছেন। সেটা হলো—ভগবানকে ভালবাস, নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রিত) কর, পারিপার্শ্বিককে ভালবেসে তাদের মধ্যে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা কর। তিনি বলেছেন— I am before Abraham was (এব্রাহাম যখন ছিলেন না, তখনও আমি ছিলাম)। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন, তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি, ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ' (আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে, সেগুলি আমি জানি, কিন্তু তুমি জান না)। যীশু বলেছেন—He who loves anything more than me is not worthy of me (যে আমার চাইতে অন্য কিছু বেশী ভালবাসে সে আমাকে পাওয়ার যোগ্য নয়)। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' (সমস্ত প্রবৃত্তির ধর্ম্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমাকে রক্ষা করে চল)। আবার আছে—'মন্মনা ভব, মদ্ভক্তো, মদ্যাজী মাং নমস্কুরু' (আমাগত চিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমাকে যাজন কর, আমাকে নমস্কার কর)। প্রাণভরে তাঁকে ভালবাসা এবং অন্তরে-বাহিরে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কাজ। সর্ব্বশাস্ত্রের মূল কথা এইটে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে। ইদানীং বেশির ভাগ সময় যতি-আশ্রমে থাকেন এবং যতিদের করণীয় সম্বন্ধে নানা নির্দ্দেশ দেন। শরৎদা (হালদার), নরেনদা (মিত্র), প্রভৃতি উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন—নাম করা লাগে constantly (সর্ব্বদা), without break (নিরবচ্ছিন্নভাবে)। আর যা কয়ে দিচ্ছি তা চরিত্রে আঁকা লাগে। চাউনি, চলন, বলন, ব্যবহার, এক-কথায় সব-কিছু নিখুঁত হওয়া চাই। শুধু আঁকা নয়, এমনভাবে অভ্যস্ত হতে হবে যাতে অজ্ঞাতসারেও চলি, করি ঐভাবে। ইষ্টানুগ চলন যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজ হয়ে যায়। অনেক সময় আমরা ভুল করে তার পরে বুঝি। কিন্তু এতখানি সচেতন হওয়া লাগবে, যাতে ভুল হওয়ার আগেই বুঝে তার মোড় ফিরিয়ে দিতে পারি। subconscious plane-এ (অবচেতন স্তরে) কত কী থাকে তা আগে ঠিক পাওয়া যায় না, গভীর নামধ্যান ও আত্মবিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে সেগুলিকে conscious plane-এ (চেতন স্তরে) নিয়ে এসে actively (সক্রিয়ভাবে) adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগে, অচেতন বা জন্মের পূর্ব্বকালীন ভূমিতে যা আছে সেগুলিকেও চেতনভূমিতে নিয়ে এসে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। এতখানি না করলে অখণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না। আমার মনে হয়, এইভাবে সাধনা করতে পারলে জাতিস্মরতার জাগরণ হতে পারে। আর জাতিস্মরতার জাগরণ যার হয় সে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য ইষ্ট ছাড়া আর কিছু চাইতে নেই। অন্য দিকে মন গেলেই ক্ষতি।

সবসময় সাবধান থাকতে হবে। Evil (মন্দ)গুলি তাড়ান লাগবে। কিছুতেই একমুহূর্ত্তের জন্য প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এর জন্য গোড়ায় চাই কঞ্জুষের মত ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়া।

আপনারা কয়েকজন এইভাবে দাঁড়িয়ে গেলে সিদ্ধসঙ্কল্প হয়ে যাবেন। আমার প্রত্যেকটি ইচ্ছাই পূরণ করতে পারবেন। আমার ইচ্ছাই তখন আপনাদের ইচ্ছা হয়ে দাঁড়াবে। তখন শত পরিশ্রমেও ক্লান্ত হবেন না। দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, অপমান কিছুই গায়ে লাগবে না। ইষ্টনেশায় মাতাল হয়ে থাকবেন। ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে টাকাপয়সা, ঘরসংসার সবটার সঙ্গে সম্পর্ক adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারবেন।

আপনাদের কাছে আগে আমি, তারপর সংসার ও অন্য যা কিছু। দেখবেন সংসার যেন কখনও আমার থেকে বড় হয়ে না দাঁড়ায় আপনাদের কাছে। মা-বাবার প্রতি বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাদের দেওয়া শরীর নিয়ে চলছি। তবু

cautiously (সাবধানে) চলা লাগে। শুনেছি চৈতন্যদেব মার সঙ্গে দেখাই করেন নি। স্মরণ রাখবেন—ইষ্টের চেয়ে থাকলে আপন, ছিন্নভিন্ন তাঁর জীবন। আবার আছে—ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়, অর্থাৎ যে কায়মনোবাক্যে ভগবদ্ভজনশীল, তাঁতেই যে সমাহিত, ভগবানের দয়ায় তার সংসার অচল হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে এক অপূর্ব্ব দিব্য বিভা। ঈশ্বরীয় আবেশে তিনি অনর্গল প্রাণ ও প্রেরণা ঢেলে দিয়ে চলেছেন।

এই করতে করতে সবই আপনাদের ভিতর ফুটে উঠবে—আপসোস আসবে—এই করি নি, করলে পারতাম। আশাও আসবে—তাঁর দয়ায় এতটুকু যখন করতে পেরেছি, এটাও পারব। করলেই হবে। তাঁর দয়ার ত অন্ত নেই। নীতিগুলি, সঙ্কেতগুলি যত বাস্তবে প্রয়োগ করবেন, ততই বুঝতে পারবেন।

পূর্ব্ব কথার সূত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মনে রাখতে হবে আমরা এখানে এসেছি বৃত্তিগুলি পোষার জন্য নয়, এসেছি সেগুলির নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধনের জন্য। নিজে শায়েস্তা হ'লে নিজের ও সেইসঙ্গে আরো দশজনের মঙ্গল করতে পারব। এইটেই হ'লো আসল কাজ। এটা বাদ দিয়ে যতই হৈ চৈ করি না কেন, কাজের কাজ কিছু করতে পারব না, ছ্যাঁচড়ামি করাই সার হবে। আচরণ ও সঞ্চারণা সমান তালে চলা চাই। যা'র বলার সঙ্গে করার মিল থাকে, তা'র বলা শক্তিশালী ও কার্য্যকরী হয়। ইষ্টের প্রতি যা'র সক্রিয় ভাবভক্তি, অনুরাগ থাকে, তা'র প্রতিটি নিঃশ্বাসে অজ্ঞাতসারে জীবজগতের মঙ্গল হয়। প্রেমী ভক্তরাই পৃথিবীর পরম সম্পদ।

নরেনদা—বুঝি সব, কিন্তু complex (প্রবৃত্তি)ই সর্ব্বনাশ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Complex (প্রবৃত্তি) যেন আপনাকে entice (প্রলুব্ধ) করতে না পারে। হয় তাকে গুরুসেবায় লাগাতে হয়, নয় তার প্রতি নিরাশী-নির্ম্মম হতে হয়। যা, আমার ঠাকুরসেবায় লাগে না, তা'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? এমনতরভাবে ইষ্টগতপ্রাণ হ'য়ে থাকতে হয় যা'তে তাঁর পরিপন্থী কোন-কিছু আমার কাছে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না পায়। আধ্যাত্মিক জীবনে যদি এমনটা হয়, ঘাত-প্রতিঘাতময় দৈনন্দিন বাহ্য জীবনেও এমনটা হবে। হুবহু ইষ্টকে নিজের মধ্যে বসান চাই নিজ বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে। সমগ্র সত্তাটাকেই তাঁর ভাবে ভাবিত ক'রে তুলতে হয়, তাঁর মনোমত ক'রে তুলতে হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কেমন আশার বাণী বলেছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

চাই এই আত্মসমর্পণ। নিজেকে নিঃশেষে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে নিরন্তর

তাঁকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে পারলে ধর্ম্মাধর্ম্মের বন্ধন তাঁর দয়ায় কেটে যাবে এবং নিরন্তর ব্রাহ্মী স্থিতিরূপ মুক্তি লাভ হবে। এ কিন্তু প্রাণহীন কসরতের ব্যাপার নয়। তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে হয় নিজেকে, একেবারে তাঁর হ'য়ে যেতে হয়, আমার কী হবে একথা ভাবতেই হয় না।

এমনতর হ'য়ে ওঠার পথ তিনি অতি সহজভাবেই ব'লে দিয়েছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।"

আমাগত চিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার যাজন কর, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়জন। তোমাকে আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি যে এইভাবেই তুমি আমাকে পাবে।

কেমন উদাত্ত ঘোষণা! আবোল-তাবোল কত কাজ করি। আর এইটুকু করতে পারব না! তাঁর সঙ্গে রগে-রগে জড়িয়ে ফেলতে হয় নিজেকে। একটা লহমাও যেন না কাটে তাঁকে বাদ দিয়ে। যাজন কিন্তু এক মহা-উপভোগ। এতে যুগপৎ যাজক ও যাজিত ঈশ্বরীয় আনন্দ উপভোগ করে।

কেমন সুন্দর বলেছেন—

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"

যেন-তেন-প্রকারেণ তাঁতে সততযুক্ত থাকতে হবে। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি স্বস্ত্যয়নী, সদাচার পালন করছেন, অথচ মানুষ আপনাদের সান্নিধ্যে এসে অল্পাবিস্তর ইষ্টস্পর্শ পাচ্ছে না, তার মানে তখনও পর্য্যন্ত আপনারা তাঁর রংএ রঙ্গিন হয়ে ওঠেন নি। ইষ্টানুরাগ যখন মানুষকে পেয়ে বসে, তখন তা'র চালচলন, রকমসকম, কথাবার্ত্তা সব কিছুর ভিতর দিয়ে তা' ফুটে বেরোয়। লোকে সত্তার খোরাক পায়, তা'র কাছে এসে। প্রাণ জুড়োয় তা'কে দেখে।

কালিদাসদা—আপনি যা' চান, তা'র থেকে ত আমরা অনেক দূরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইসব নেতিবাচক কথা ঠিক নয়। পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের মধ্যে তোমরা কেন এখানে এসে জুটলে? তোমরা কয়েকজন যতি-হিসাবেই বা কেন এখানে একত্র আছ? সবটার পিছনে একটা কারণ আছে না? যেভাবে বলছি সেইভাবে যদি চল, দেখবে তোমাদের দিয়ে কত লোক উপকৃত হবে। অবশ্য তোমাদের চলা চাই, করা চাই আমার কথা-মত। এ ব্যাপারে

তোমরা পরস্পরের সহায়ক হবে। আমি যেমন ভালবেসে তোমাদের দোষ ধরিয়ে দিই, গুণের তারিফ করি, তোমরাও নিজেদের মধ্যে তেমনি করবে। এ করতে গিয়ে কারও অহংকে আহত করবে না, কাউকে খাটো করবে না। নিজের দোষ থাকলে অকপটে তা'ও স্বীকার করবে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের তপস্যার সহায়ক হবে কিন্তু ভাবে ব্যাঘাত করবে না। চরিত্রগঠনের ব্যাপারে কমা, সেমিকোলনও উপেক্ষা করবে না। সামান্য-সামান্য দোষ পুষে রাখলেও তা' এক সময় মহা-বিপর্য্যয় সৃষ্টি করতে পারে। এমন কোন প্রবৃত্তি যদি তোমার থাকে, যা' তোমার ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় সামান্যমাত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তা'কে বিন্দুমাত্র খাতির করবে না। নামধ্যান, ভজন নিবিড় নিষ্ঠাসহকারে করতে হয়, মনের অতলতলে ডুব মেরে দেখতে হয় কোন্ কামনা, কোন্ বাসনা, কোন্ প্রবৃত্তি, কোন্ প্রবণতা তোমার ইষ্টানুচলনে বাধা সৃষ্টি করছে। প্রবৃত্তিগুলির বহু ছদ্মবেশী রূপ আছে যা' সহজে ধরা পড়ে না। তা'র মূলে পৌঁছে তা'কে ইষ্টসেবার অনুকূল ক'রে তুলতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে 'যতিচর্য্যা'-নামক বাণীটি পড়তে বললেন।

পড়া হলো—

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হও—
তপঃপ্রাণ হও—
সংবুদ্ধ হও—
বীর্য্যবান হও—
অক্লান্ত তেজীয়ান পরিশ্রমী হও,
দায়িত্ব নিতে শেখ—
সৎসম্বর্দ্ধনী যা'—তা'র,—
আর তা'র অনুপূরণও ক'রো—
বিহিতভাবে—বিহিত সময়ে,
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা ক'রো না—
তাতে নিরাশী হও—
নির্ম্মম হ'য়ে ওঠ তাতে,
নিরখ-পরখ কর নিজেকে—
আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণে
অন্তরকে সবসময় ঝকঝকে ক'রে রাখ,
কৌশলী ও তীক্ষ্ণধী হও,

সদাচারে শরীর ও সত্তাচর্য্যী হও,
সৎ ও সুভাষী হও,
প্রীতি, সৌজন্য, সেবা, সহযোগিতায়
সবারই সম্বর্দ্ধনী ক'রে তোল নিজেকে,
কলঙ্ক, দ্বন্দ্ব ও দুর্ব্বলতাকে তিরোহিত ক'রে
অন্যায় বা অসৎ যা' তা'কে নিরোধ ক'রে
আলোকে উল্লসিত থাক
এবং ক'রে তোল সকলকে—
তপশ্চেতা হ'য়ে
ধর্ম্মানুগ সর্ব্ব সৎকর্ম্মে
নিয়োজিত থেকে,
স্বাধ্যায়ী হ'য়ে
জীবন-প্রবৃদ্ধি
ও স্মৃতিবাহী চেতনার পথকে
অনুসন্ধান কর—
এবং তা' বাস্তবীকরণে বিহিত ব্যবস্থাবান হও,
আর, সব কিছু নিয়ে
প্রিয়পরমে সার্থক হ'য়ে ওঠ,
এই হ'চ্ছে—
যা' কিছু সবেরই পরম সার্থকতা।

বাণীটি পড়া হওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এর মধ্যে fundamental (মূল) কিছুই বাদ নেই—সঙ্কল্প চাই অতন্দ্র চেষ্টায় আমি মানুষটা ঠিক ওই হব।

শরৎদা—তপঃপ্রাণ হওয়া বলতে কী বোঝায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তপঃপ্রাণ হওয়া মানে নামধ্যান ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ ইষ্টানুপূরণী কর্ম্মনির্ব্বাহ। নীতিগুলি করায় না আসলে বিহিত চারিত্রিক বিন্যাসই হবে না, জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে না, বৈশিষ্ট্য-সংবর্দ্ধনাই হবে না। গোটা মানুষটা ভাগবত মানুষ হ'য়ে যাওয়া চাই। সে একচুলও প্রবৃত্তির তাঁবেদার নয়, ষোল আনা খোদার খিদমদগার সে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তামাক খেতে খেতে বললেন—আমার একাদশে রাহু আছে, তাই Absolute (পরম)-এর concrete materiali-

sation (মূর্ত্ত রূপায়ণ) না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই সোয়াস্তি পাই না। মানুষ একটু স্বপ্ন দেখলে, কি বাণী শুনলে, কিম্বা একটু শিব, দুর্গা বা কালী দর্শন করলে তাতেই মসগুল হয়ে থাকে ; কিন্তু ওসব যে আমার কত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আপনারাও শুনেছেন কিছু কিছু। আমি সেগুলিকে মূল্য দিই কমই। অথচ এর ছিটে-ফোঁটা নিয়ে কতজনে মহাপুরুষ সেজে বসে। আমি কাউকে খাটো করতে চাই না। কিন্তু আমার কথা এই যে, মানুষের সব প্রবৃত্তি যদি ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত না হয়, সে যদি সপরিবেশ সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ভক্তি, ভালবাসা, জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম, সেবা ও ঐশ্বর্য্যে উচ্ছল হ'য়ে না ওঠে, তার সামগ্রিক জীবন যদি বিকশিত না হয়, তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে, অসৎনিরোধী পরাক্রম যদি না জাগে, বর্ণাশ্রম যদি পরিপালিত না হয়, সুবিবাহ, সুজনন ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা যদি না হয়, বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ যুগপুরুষোত্তমের প্রতি নিষ্ঠা যদি না থাকে, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি যদি অবদলিত হয়, এককথায় প্রকৃত ধর্ম্ম যদি ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে রূপায়িত না হয়, তাহ'লে একপেশে চলনায় দেশের দশের ও জগতের সর্ব্বতোমুখী কল্যাণ সুদূরপরাহত।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে বললেন—চরিত্রগঠনের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের জ্ঞানের পরিধিও বাড়ান লাগবে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর পেঙ্গুয়িন ও পেলিক্যান সিরিজের যেসব বই আছে, সেগুলি জোগাড় ক'রে ভাল করে প'ড়ে ফেলা লাগে।

নরেনদা—নামধ্যানের সময় মনের চাঞ্চল্য দূর করা যায় কীভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামধ্যানের সময় মনের flickerings (বিক্ষেপগুলি) দেখে যাওয়া লাগে, কিন্তু সেগুলির সঙ্গে identified (একীভূত) হ'তে নাই। সেগুলিকে দেখতে হয় এবং adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয়। অভ্যাস করলেই হয়। শুধু নামধ্যানের সময় নয়, সর্ব্বদা প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে থাকতে হয়, প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তি ব'লে চিনতে হয় এবং ইষ্টময় থেকে প্রবৃত্তিগুলির সাত্বত বিনিয়োগে অভ্যস্ত হ'তে হয়। অষ্টপ্রহর ইষ্টকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হয়। তখন নামধ্যান বা ভজনে বসলে মন সহজেই ইষ্টে লগ্ন ও মগ্ন হয়। ক্রমে মন নিস্তরঙ্গ ও সমাধিলীন হয়।

২৪শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৫ (ইং ৭।৪।৪৯)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে। পুলিনবাবু (চ্যাটার্জ্জি, কলকাতা পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী) কিছুদিন দেওঘরে ছিলেন। তিনি স্থানীয় উকিল হিরন্ময়বাবু (ব্যানার্জ্জি)-র আত্মীয়। এখানে থাকাকালে পুলিনবাবু মাঝে মাঝে

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসতেন। আজ তিনি কলকাতায় ফিরে যাবেন। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছেন। সৎসঙ্গ-আশ্রমের জমি সম্বন্ধে কথা উঠলো।

পুলিনবাবু—আমি কলকাতার কাছে জমির ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের পয়সা নেই, প্রয়োজনে আছে, তাই বুঝে ব্যবস্থা করবেন।

এরপর সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভগবান দুই নয়, ধর্ম্ম দুই নয়। প্রেরিত পুরুষদের বাণীও মূলতঃ এক। আর, আমাদের শাস্ত্রে আছে পূর্ব্বপূরণী বর্ত্তমান মহাপুরুষকে মানার কথা। তাঁতে পূর্ব্বতন সবাই জীয়ন্ত থাকেন। লাখো দল হোক, একে আনতি থাকলে, ঝুঁটি একটা ঠিক থাকলে, Spine (মেরুদণ্ড)ও Vein (চিন্তাধারা) ঠিক থাকলে Inter-Interested (পরস্পর স্বার্থান্বিত) হ'য়ে ওঠেই। একজনের দুঃখকষ্ট আর একজন নিজের কষ্ট ব'লেই মনে করে, এবং তার নিরাকরণ না ক'রেই ছাড়ে না। সে তা' করে নিজস্বার্থ বোধে। এই জিনিসটা না থাকায় আজ প্রত্যেকেই মনে করে সে অসহায়। এত ঠকলাম, ভুগলাম, কিন্তু তাঁকে ধরলামও না, তাঁর জন্য যা' করবার তা' করলামও না, তাই বুঝলামও না। ঘুরি পাগলের মত Being obsessed by complexes (প্রবৃত্তি অভিভূত হ'য়ে)।

পুলিনবাবু—আপনার কথা অতি সত্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছিলেন এখানে। মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম। আজ চ'লে যাবেন শুনে ভাল লাগছে না। ফাঁক পেলেই আবার আসবেন।

পুলিনবাবু—হ্যাঁ।

এরপর পুলিনবাবু প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

পরে শরৎদা (হালদার) যাজনের রীতি সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ নিজের ভালই চায়। কিন্তু প্রবৃত্তির অভিভূতি থাকে ব'লে কিসে নিজের ভাল হয়, তা' ধরতে পারে না। তার ভালটা কিসে হয়, তা' দেখিয়ে দিতে হয়। প্রেষ্ঠে অনুরতি হ'লো সেই জিনিস যা' আমাদের মঙ্গলের পথ খুলে দেয়।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Independence (স্বাধীনতা) মানেই Interdependence (পারস্পরিক অধীনতা)। একক কেউই বাঁচতে পারে না, দাঁড়াতে পারে না।

শরৎদা—মানুষ কষ্ট পায় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অজ্ঞতা আছে ব'লে। মানুষ নিজের অজ্ঞতার স্বরূপ যদি পুরোপুরি ধ'রে ফেলতে পারে, তখন তার নিরাকরণ না ক'রেই পারে না। শুধু বুদ্ধির বুঝ যথেষ্ট নয়, সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করা চাই। ঐ ধরনের উপলব্ধি আস্‌লে বুদ্ধদেবের মত উক্তি আসে—'হে গৃহকারক! আমি তোমাকে দেখতে পেয়েছি, তুমি আমাকে প্রলুব্ধ ক'রে আর গৃহনির্ম্মাণ করতে পারবে না।"

সুশীলদা (বসু) আসলেন। নরেনদা (মিত্র), যতীনদা, শরৎদা, কালিদাসদা প্রভৃতি আছেন। আত্মসংগঠন সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজের সাংসারিক ও অন্যান্য যাবতীয় কর্ম্মের ভিতর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলে পাকা হওয়া যায়। যে-সব সৎ চিন্তা, ভাবনা বা সিদ্ধান্ত করেন, সেগুলির প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। আমি সন্ন্যাস চাই, কিন্তু সন্ন্যাসটা সাজা-সন্ন্যাস না।

সুশীলদা—গেরুয়া নাকি অনেকটা সাহায্য করে, তাই গেরুয়া নেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাহায্য করুক ক্ষতি নাই, কিন্তু বাহ্যিক বেশটাই সর্ব্বস্ব না হয়। আমার কথা—বাস্তবজীবনে ধর্ম্মপরিপালন।

সুশীলদা—'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্‌'-এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামজপ এবং তা' যাতে গমন করে, তা' মনন করা, হওয়া, পাওয়া সবগুলি আছে এর মধ্যে। ভাবনার মধ্যে ভূ অর্থাৎ হওয়া আছে। নাম সার্থক হয় নামীতে। তাই নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী নামী অর্থাৎ ইষ্টের চলন-চরিত্রে তেমনি করতে হয়। শুধু যজনে হয় না। যাজন বাদ দিলে যজনও ব্যাহত হয়।

প্রফুল্ল—এ সম্বন্ধে আপনার সুন্দর একটা বাণী আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী? পড়না!

যাজন-সংকেত এনে পড়া হ'লো।

যাজন মানুষকে সপারিপার্শ্বিক অস্তিবৃদ্ধির
সেবায় উন্মুখ ও অভ্যস্ত করিয়া
ইষ্টপ্রাণনে অটুট করিয়া তুলিয়া
মননকে আরোতর সম্বেগশালিতায়
উদ্দীপ্ত করিয়া
বাস্তবকর্ম্মে আপ্রাণ বেগে নিয়ে যেতে পারে,
আর এমনই করিয়াই
মানুষকে অনুভূতি-সম্পদে নিয়তই

সম্পদশালী করিতে থাকে ;
তুমি যদি তোমার প্রাত্যহিক জীবন হইতে
তাহাকে প্রতারিত কর,
তোমার ধ্যান ও মনন যে ক্রম-অবসাদে
নিমজ্জিতই হইতে থাকিবে
সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই,—
যদি ধ্যানী ও মননশীল হইয়া
অমৃতযাত্রীই হইতে চাও,
তবে ইষ্টপ্রাণ সেবাপটু হইয়া
তোমার প্রাত্যহিক জীবনে নিত্যকরণীয়
ইষ্ট-যাজনকে কিছুতেই ত্যাগ করিও না ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক সময় যাজনে এমন ফল দেয় যা' সাধনে পাওয়া যায় না। অবশ্য যজনহীন যাজনও হয় না । যজনে চর্য্যাগুলি ঠিক করতে হয়, আর পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ রাখতে হয় । যজন ও যাজনের নিত্যসম্বন্ধ ।

প্রফুল্ল—আপনার এ সম্বন্ধেও বলা আছে ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পড় ।

পড়া হ'লো—

যাজন যখনই যজনকে অনুসরণ করে না তখন তার উপসংহারে
ব্যষ্টি, সমাজ ও জাতির ধ্বংসকেই—
নিমন্ত্রণ ক'রে আনে ;
কারণ, মানুষকে যা' উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলছে—
তা যদি অনাচরণজনিত দোষে ক্লিষ্ট হ'য়ে
অবসন্ন হ'য়ে থাকে,
সেই অবসন্নতার ভিতর দিয়ে
ignorance (অজ্ঞতা) তা'কে অধিকার ক'রে
বিকট বিক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে
অনবরত প্রয়াস পায়,
তাই, যিনি যাজক
তিনি যদি Ideal-এ thoroughly interested
(আদর্শে সর্ব্বতোভাবে স্বার্থান্বিত)
ও আচারবান না হ'য়ে

যাজন করতে যান.

তবে তা' সমূহ বিপদেরই কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ এবং প্রফুল্ল প্রভৃতি উপস্থিত।

প্রফুল্ল—মুক্তি বলতে একেবারে জন্মরাহিত্য হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ তা' হবে না কেন ? জন্মরাহিত্য ত তোমার আছেই। তোমার অপরা প্রকৃতি যা' আছে, তার পারে যখন গেলে তখন জন্মেও তুমি জন্ম নি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, প্রকৃতি ও জন্মমৃত্যুর অধীন ভূতগণকে আমি বারবার সৃষ্টি করি। কিন্তু আমি অনাসক্ত ও উদাসীনের মত থাকি ব'লে সেই সব কর্ম্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না।

মানুষ যদি আত্মাভিমানশূন্য হয়ে একমাত্র ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার্থে যা' কিছু করে, তাহ'লে সে জীবন্মুক্ত হ'য়ে যায়। জীবন্মুক্ত মানে দেহ থেকে মুক্ত নয়, দেহে থেকেও মুক্ত। আবার গীতার মধ্যে এ কথাও আছে, আমি কর্ত্তা এই অভিমান যাঁর নেই, এবং যাঁর বুদ্ধি কর্ম্মফলে লিপ্ত হয় না, তিনি জগতের সমস্ত প্রাণীকে হত্যা ক'রেও হত্যাকারী হন না বা হননক্রিয়ার ফলভোগী হন না। অর্থাৎ যে জন্মলাভ ক'রেও কায়মনোবাক্যে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে চলে সে দেহবান হ'য়েও শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত দেহাতীত আত্মার স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয় না। এটাও একরকমের জন্মরাহিত্য। ঐ যে বলেছি স্ব-অয়নস্যূতবৃত্ত্যভিধ্যান তপস্যায় গতি ও অস্তি অধিজাত হইল, ঐটে পরাপ্রকৃতি।

জনৈক দাদা—কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আছি, আমি যখন স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে তাতে আনত হই, তার মধ্য দিয়ে হয় সন্তান। তেমনি পরমপিতার মধ্যেই আছে বৃত্তি, তিনি তাতে যখন মন দেন, তখন হয় সৃষ্টি। কিন্তু স্রষ্টা হ'য়েও সর্ব্বদা তিনি সাক্ষীস্বরূপ থাকেন। তাঁর কোন বন্ধন হয় না।

প্রফুল্ল—পরমপিতার ক্ষেত্রে ত বন্ধন নেই সৃষ্টিতে !

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার ক্ষেত্রে তুমিও আছ, তাঁকে বাদ দিয়ে তুমি নও। তাঁর প্রীত্যর্থে যদি তুমি সব কিছু কর, তোমারও বন্ধন থাকবে না।

শরৎদা—সংসারের চিন্তা যদি আসে তখন কী করণীয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোপাল নাকি বলতো—আমি ভাবি আমি বর্ত্তমানে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি, তাই এদের আমি আপন মনে করি, আর এরাও আমাকে আপন ভাবে। আমি মরে গিয়ে যখন আর এক জায়গায় জন্মগ্রহণ করব, তখন তা'রাই আপন হবে। এদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। এইভাবে দেখা

যায় সংসারের কেউ আমার চিরন্তন আপন নয়। তাই আমার চিরকালের আপন যিনি, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা অটুট রাখাই ভাল। বাজে বেশী জড়িয়ে লাভ কী? কথাটা ভারি ঠিক।

জনৈক দাদা—সংসারে জড়ায়ে যায় ত!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনিই জড়ায়ে যায়, তারপর যদি জড়ানর পথে চলি, তাহ'লে ত কথাই নেই। মরণ ত এমনি আসে। আবার যদি মরণের পথে চলি, তাহ'লে মরণ এগিয়ে আসবে।

শরৎদা—মমত্ববোধ না থাকলে ত সৃষ্টি থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৃষ্টি হয় থাক্, না হয় না-থাক্, হয় আরো হো'ক, না হয় নিভে যাক্। কিন্তু আমি যে তোমারই—এ সিদ্ধান্ত ত টুটবে না। সৃষ্টি থাকবে কি না-থাকবে, সে তোমার ইচ্ছা! "Thy will be done" (তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হো'ক)।

শরৎদা—তাহ'লে শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, বিবাহ, প্রজনন ইত্যাদি সম্বন্ধে এত বলা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবটার মধ্যে আমার ঐ এক সূতো আছে—তাঁকে চাই, তাঁর জন্যেই আমার যা' কিছু। জালের দড়ি ঠিক আছে, টানলেই সব গুটিয়ে এক জায়গাতেই আসে। এখন যদি ঐ সব চিন্তা করতে যাই, সৃষ্টির কী হবে, কে বাঁচবে, কে মরবে, এক কথায় যা' জানি না, বুঝি না, তাই নিয়ে অযথা টানা-হ্যাঁচড়া করি, তাহ'লে আমাদের আসল জীবন অর্থাৎ ইষ্টমুখী জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আসল জীবন যাতে ঠিক থাকে এবং দীর্ঘদিন পরিপুষ্ট হয় তাই করাই ত ভাল। আপনার Family (পরিবার) বলতে ত বিশ্বদুনিয়া। তাই বলে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। যতি মানুষ, দশজনের কাছ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ ক'রে খাবেন, খাবেন যে সেও ভাগ ক'রে সবাই মিলে খাবেন, নিছক নিজের জন্য যথাসম্ভব আলাদা ক'রে কিছু সংগ্রহ করতে যাবেন না। অবশ্য আপনার যদি অসুখ হয়, আপনি যদি ওষুধ খান, সুস্থ মানুষকেও সেই ওষুধের ভাগ দিতে হবে, এমন কোন কথা নয়। একটা বরবটি কিনে আনলেন, পাঁচজনকে তার এক একটা দানা ভাগ ক'রে দিয়ে সবাই মিলে খেলেন। তাতে আত্মপ্রসাদ আছে, বিস্তার আছে আপনার। নিজেরই মত মনে ক'রে যদি অপরকে দেন আপনার গণ্ডীটা বেড়ে যাবে। যতিদের দোকানে খাওয়ার কথা বারণ করেছি। এর মধ্যে সদাচারের দিকও আছে, আবার একাকী Selfish enjoyment (স্বার্থপর উপভোগ)-ও কিছুটা Checked (বাধাপ্রাপ্ত) হয় এতে। অনেকে আছে পয়সা পেলেই মিষ্টির

দোকানে গিয়ে একাকী কিছু খেয়ে নেয়।

কালিদা—গণ্ডী বাড়িয়ে কী হবে? আমি আর তিনি ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ও তিনি এইত কথা। কিন্তু সব আমিই ত তিনি। তাঁকে বাদ দিয়ে যেখানে কেউ নেই, সেখানে আমি বাদ দিই কাকে? তাই সাধ্যমত বৃহত্তর পরিবেশকে নিয়ে তাঁর পথে চলতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী যতিরা রোজ ভিক্ষা করে যা' পান, তাই খান। ভিক্ষার রীতি ও তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি বললেন—ভিক্ষা করবে, কিন্তু কাউকে বিরক্ত ক'রে ভিক্ষা ক'রো না। এর জন্য ঢের এৎফাঁক করা লাগবে যাতে কেউ বিরক্ত না হয়। ঐ সামান্য ব্যাপার থেকে বহু analysis (বিশ্লেষণ) ও synthesis (সংশ্লেষণ) হ'তে থাকবে। ভিক্ষার প্রত্যাশী হ'য়ে থাকবে না। যাকে বলা যায় ভিক্ষালোভী হওয়া।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত দুটি বাণী দিলেন—

ভিক্ষালোভী হ'তে যেও না,
ভিক্ষাব্যবসায়ীও হ'তে যেও না;
ভিক্ষাটা
নিজেকে পরীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ,
সমাবেশ ও সংশুদ্ধির জন্য—
সেবাচর্যার ভিতর দিয়ে
বাক্যে, ব্যবহারে, অনুকম্পায়,
দান ও গ্রহণের ভেতর দিয়ে
দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই
সংবুদ্ধ ও সম্বর্ধিত করতে
বাস্তব কর্ষণায়।

এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। বিকালে যাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে এসেছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাই বাড়ী ফিরে গেছেন। যতি-আশ্রমের পরিবেশ শান্ত, সমাহিত। তাপসবৃন্দ যেন ত্রিলোকত্রাতার সাক্ষাৎ-সংশ্রবে যোগানন্দরস পানে তূরীয়ভাবে বিভোর।

সর্ব্বভাবাতীত প্রাণেশ প্রভু পরক্ষণেই ভাবলীন কণ্ঠে বললেন—

যাই ভিক্ষা কর
অর্থাৎ, যাই আহরণ কর না কেন—
তা' অন্তত নিজের ইষ্টগোষ্ঠী

অর্থাৎ, সমতপা যারা একসঙ্গে আছ
তা'দের যথাপ্রয়োজন আর যথাসম্ভব
পরিবেষণ করেই উপভোগ করো—
সদাচারে,
তাতে আত্মপ্রসাদ ও আত্মপ্রসার
উভয়েরই সম্ভাব্যতাকে
সূচিত করবে।

প্রফুল্ল—পুনর্জ্জন্ম না হওয়া সম্ভব কিনা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার বৃত্তির গহ্বরে পড়ার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তখন তোমার আর জন্ম হবে না। তোমার মায়িক সংস্কার ও বন্ধনগুলি খ'সে গেলে তোমার পরাপ্রকৃতিই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে, যাকে বলে কৈবল্য—মহাচেতনসমুত্থান, তৃষ্ণার নির্বাণ। ঐ অবস্থায় গত হ'লে নিজের entity (সত্তা) নিয়ে থাকে। পরমপুরুষের কাজের জন্য প্রয়োজন হ'লে আবার আসতে পারে। তাঁর যে আবির্ভাবে যার যার প্রয়োজন সে-সে তখন আসে। তিনি ইচ্ছা করলে বিশেষ কাউকে আদৌ নাও আনতে পারেন।

প্রফুল্ল—তাঁকে যারা ভালবাসে, তারা কি তাঁর সঙ্গে না এসে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসার আবার বৈশিষ্ট্য আছে। যখন যে বৈশিষ্ট্যে আসেন, সেই বৈশিষ্ট্যের সহানুধ্যায়ী যারা, তারা আসে।

প্রফুল্ল—মহাপুরুষদের সঙ্গেও গোড়া থেকেই প্রবৃত্তিভেদী টানওয়ালা মানুষ তেমন দেখা যায় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃত্তি না থাকলে যে জন্মই হয় না। কাউকে হয়ত দেখা গেল বৃত্তি-অভিমুখী জীবন যাপন করছে, কিন্তু মহাপুরুষের সংশ্রবে আসার পর সে এমন turn (মোড়) নিল, যে তার জীবন যেন নূতন জীবন হ'য়ে গেল। তারা তখন আবার প্রবৃত্তি-আচ্ছন্ন বহুমানুষকে প্রবৃত্তিমুখী চলন থেকে কিছুটা প্রতিনিবৃত্ত ক'রে ঐ মহাপুরুষের সঙ্গে ভালবাসার যোগে যুক্ত ক'রে তোলে। এই যে পরিবর্তনটা হয়, এর পিছনে একটা কারণ আছে ত! যেমন জগাই-মাধাইয়ের মত কত মানুষই হয়ত ছিল, তার চাইতে ভালও কত মানুষ ছিল, তাদের পরিবর্তন না হ'য়ে ওদের যে ঐরকম পরিবর্তন হ'লো তার কারণ কী ? কিছুই ত বিনা কারণে ঘটে না! দস্যু রত্নাকর যে বাল্মীকি হ'লো, বাল্মীকি হ'য়ে ওঠার মত অন্তর্নিহিত সম্ভাব্যতা যদি তার না থাকতো, তা হ'লে কি সে তা' হ'তে পারত ? সত্যদ্রষ্টা যাঁরা তাঁরা আগাগোড়া সবটা দেখেন। নারদ তাই রত্নাকরকে ঐ অবস্থায় দেখে হতাশ হন নি।

গিরীশ ঘোষ ছিল মাতাল। তাই নিয়ে কত ভক্ত ঠাকুরের কাছে অনুযোগ-অভিযোগ করত, কিন্তু ঠাকুর ওসব কথায় আমলই দিতেন না। ভাল মন্দ যার যাই থাক, শুধু ইষ্টের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে পারলেই হয়। ভালও ভাল নয় যদি তা' ইষ্টে নিবেদিত না হয়, ইষ্টসেবায় লেগে সার্থক না হয়, আবার মন্দও মহামঙ্গলকর হ'তে পারে যদি তা' আত্মস্বার্থশূন্য হ'য়ে ইষ্টস্বার্থে নিয়োজিত হয়। হনুমান লংকাদহন, রাবণের মৃত্যুবাণহরণ ইত্যাদি কত কি না তথাকথিত অপকর্ম করেছে তা'র প্রভু লোকাভিরাম শ্রীরামচন্দ্রের জন্য। কিন্তু হনুমানের মত বীরভক্ত কয়জন মেলে? যা ঈশ্বরপ্রীতিকর কর্মে প্রযুক্ত না হয়, তেমনতর সম্পূর্ণও অবগুণ ও বন্ধনস্বরূপ। তাই ব'লে আত্মস্বার্থী দুর্নীতি বা অপরাধ কখনও সমর্থনীয় নয়।

এরপর সৃষ্টি সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সৃষ্টির মূলে হ'লো পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। ব্যোমই হ'লো সূক্ষ্মতম, ব্যোমের প্রাণ শব্দ, শব্দের প্রাণ স্পন্দন, স্পন্দনতরঙ্গের প্রবাহ ঘাতপ্রতিঘাত থেকেই সূর্য্য, চন্দ্র, ছায়াপথ ইত্যাদির সৃষ্টি হ'লো। ওর থেকে matter (পদার্থ) evolve করলো (উদ্ভূত হ'লো)। সূর্য্যটাও matter (পদার্থ)। যা-ই matter (পদার্থ) তাই-ই energy (শক্তি)। শক্তি চুপ করে বসে নেই। আকুঞ্চন, প্রসারণ, বিরমণ, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিচ্ছুরণ হচ্ছেই। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আদিম পারমাণবিক শক্তিকণিকার পারস্পরিক সংকর্ষণ ও সংঘাতের নানা রকমারির মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হ'লো কত কিছুর। কোন্‌টাকে কী বলে তা' আমি জানি না। কিন্তু আমি এই চোখে দেখতে পাই বিচিত্র সৃষ্টির ক্রমপর্য্যায়টা। সবটা কিন্তু বৈশিষ্ট্যওয়ালা। প্রত্যেকটার tune (তান) ও potency (শক্তি) আলাদা। অব্যক্তের বুকে কত রকমারির অভিব্যক্তি হ'লো। কত স্তর, পর্য্যায় ও প্রগতির ভিতর দিয়ে শেষটা মানুষ হ'লো। মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। তার মত আর নেই। কত বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম ক'রে সৃষ্টি এগিয়ে চলেছে। অজ্ঞতা ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই ক'রে ক'রে মানুষ ক্রমবিবর্তনের পথে অগ্রসর হচ্ছে। তাই জীবন তার কাছে এত প্রিয়। তৎসত্ত্বেও অজ্ঞতা ও বৃত্তি-অভিভূতির নিরসন না হওয়ায় সে অমৃতকে অধিগত করতে পারছে না। পারস্পরিক বিরোধ বাঁচার পথকে সঙ্কীর্ণ ক'রে তুলছে। তাই পরমকরুণাময় বার বার জ্ঞানস্বরূপ প্রেমস্বরূপ জীবনস্বরূপ রক্তমাংসসঙ্কুল নরনারায়ণ-রূপে আবির্ভূত হন সৃজনধারাকে উন্নতপ্রগতিপন্ন ক'রে তুলতে। এঁরা বহু নন, এঁরা একই। যুগপ্রয়োজনে এঁদের আবির্ভাব হয়। তাই যুগপুরুষোত্তমকে ভালবেসে যারা তাঁকে কায়মনোবাক্যে অবলম্বন ও অনুসরণ ক'রে চলে তারা অমৃতের অভিযাত্রী হয়ই কি হয়।

২৫শে চৈত্র, শুক্রবার ১৩৫৫ (ইং ৮।৪।৪৯)

প্রাতে প্রাণের ঠাকুর আমার অপরূপ রূপের আলোয় চতুর্দিক আলোকিত ক'রে ভক্তবৃন্দপরিবেষ্টিত হ'য়ে যতি-আশ্রমের দাওয়ায় এসে বসেছেন। অনিমেষ নয়নে সবাই তাঁর হাস্যমধুর প্রেমমুখপানে চেয়ে আছেন।

বুদ্ধদেব-প্রচারিত নির্বাণ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধা-ঝরা কণ্ঠে বললেন—বুদ্ধদেব বলেছেন—তৃষ্ণার একান্ত নির্বাণ হো'ক। চৈতন্যদেব বলেছেন—ওসব বুঝি না—আমার তৃষ্ণা থাক্ আর যাক্ কিছুই জানি না। আমি তোমাকেই চাই—এই আমার একমাত্র তৃষ্ণা। তুমি ছাড়া আমার আর তৃষ্ণা নাই। দুটোই মূলতঃ এক কথা। ঘুরে-ফিরে নির্বাণই দাঁড়ালো। চৈতন্যদেবের ভাবটাই তৃষ্ণানির্বাণের সহজ পথ।

শরৎদা—আপনার বাল্যকালে রচিত একটি গান কার্তিক বড় ভাল গায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন কী লিখেছি, তার কি কোন মাথামুণ্ডু আছে? দুই-এক সময়ে মনের ঝোঁকে লিখতাম। শুধু নিজের জন্যই লিখতাম। সে আমার একান্তই নিজস্ব জিনিস। কেউ তা' দেখুক, জানুক তেমন অভিপ্রায় ছিল না।

শরৎদা—আমার গানটা বেশ লাগে। কার্তিক সুরও দিয়েছে ভাল। কার্তিককে ডাকব? শুনবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার যখন এত আগ্রহ, ডাকেন। শরৎদা একজনকে দিয়ে কার্তিক পাল-দাকে ডাকালেন। কার্তিকদা আসতেই শরৎদা বললেন—'যাহারেই ভালবাসিয়াছি আমি—এই গানটা একবার গেয়ে শোনাও।

কার্তিকদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে দরদভরে দরাজ গলায় গাইলেন—

যাহারেই ভালবাসিয়াছি আমি
সেই ত আমার ছলেছে হিয়া,
কত যে বলেছে 'আমি যে তোমারই'
ব্যথার সময় গেছে পলাইয়া।
দলিত হিয়ায় আকুল নিঃশ্বাস
পাই নি কখনো একটু আশ্বাস,
আমি তো নিয়েছি বক্ষে তাহারে
ব্যথা গেছে যার হৃদয় দলিয়া।
যাহারে চুমেছি আকুল পরাণে
সেই ত ছিঁড়েছে মর্ম্মটি টেনে,

আমি বক্ষে আবেগে তুলেছি যাহারে
সেই ত গিয়াছে পদ প্রহারিয়া।
ওগো প্রিয়তম চাহিনি তোমায়
তাই ব'লে তুমি ছাড় নি ত হায়,
মোর না চাওয়ায় সুখে দুখে হায়
তুমি ত কখনো যাও নি ফেলিয়া।
তুমি প্রিয়তম জেনেছি আমারি
বেদনায় তুমি আরও যে আমারি
সকলেই ছেড়ে গিয়েছে আমারে
তুমি ত কখনো যাও নি ছাড়িয়া।

গান শেষ হবার পর সবাই অন্তর্মুখ হ'য়ে নীরবে বসে আছেন।

এমন সময় জনৈক বহিরাগত মা এসে বললেন—আমার অন্তরের মোহমেঘ কিসে কেটে যাবে বলুন। আপনি মহাপুরুষ, আপনার নাম শুনেছি, তাই আপনার কাছে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহজভাবে বললেন—মহাপুরুষটুরুষ ত বুঝি না, আমি একজন সাধারণ মানুষ। তুই মা! যেমন নিজের ভাল চাস, আমিও তেমনি চাই। কিন্তু আমি বুঝি সপরিবেশ উৎসমুখী না হ'লে আমি একা ভাল থাকতে পারি না। আমি ভাবি আমাদের মায়ামোহ তাঁতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে তাঁরই প্রীত্যর্থে সবার উপর ছড়িয়ে পড়ুক। এইভাবেই ত মায়ামোহ মুক্তির কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। তা শুধু একজনের নয়, পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে বহুর। তাই নেতিবাচকভাবে অগ্রসর না হ'য়ে ইতিবাচকভাবে এগোন ভাল। তাতে কসরতের ভাব থাকে না। সহজে হয়। যেমন, বুদ্ধদেব বললেন—তৃষ্ণার অপলাপ কর, তৃষ্ণাকে মিটিয়ে ফেল। গৌরাঙ্গদেব বললেন—তোমার তৃষ্ণার একমাত্র কেন্দ্র হউন তিনি। কোন্ তিনি?

তার উত্তরে ব'লে দিলেন—

"শ্রীকৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ,
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।"

গীতায় আবার আছে—

"বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্ভঃ॥"

কি মধুর ভাব ! এতে মানুষ আর নিজেতে নিজে থাকে না, তার সারা মন-প্রাণ-সত্তা ইষ্টময় হ'য়ে যায়। 'যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।'— এমনটা হ'য়ে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ ! টানটা আবার শুধু মৌখিক টান নয়। সক্রিয় টান চাই। বৃত্তিভেদী সক্রিয় টান হ'লে তৃষ্ণা স্থান পায় না। তাঁরই বিরহে, তাঁরই মিলনে, তাঁরই আদরে, তাঁরই অনাদরে, তাঁরই সেবায় গোটা জীবনটা কেটে যায়। অন্য তৃষ্ণার আর অবকাশ থাকে কোথায় ? অহরহ বুক ভরে থাকে তাঁকে নিয়ে। এর কি কোন তুলনা আছে ? ত্রিলোকের আধিপত্য তুচ্ছ লাগে তার কাছে। এরই নাম ভক্তি।

শরৎদা—তিনি আর আমি যখন, তখন দুনিয়ার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এত জড়িয়ে পড়া কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও তিনি, আমার মধ্যেও তিনি। পারিপার্শ্বিককে বাদ দিলে আমার আমিত্ববোধও জাগে না, অস্তিত্বও টেঁকে না, কর্ম্মদক্ষতা, জ্ঞান ও নানাবিধ শক্তির বিকাশও ঘটে না। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?" সবার মধ্যে তাঁকেই বোধ করা যায় নানা বৈশিষ্ট্যে। তিনিই ত বহু হ'য়ে আছেন। তবে এর মধ্যেই তিনি ফতুর হ'য়ে যান নি। তিনি যেমন মদাত্মা ও সর্বভূতাত্মা, তেমনি তিনি সর্বাতীত। সেটা উপলব্ধির মধ্যে আসে যুগপুরুষোত্তমকে গ্রহণ ও অনুসরণ করার মাধ্যমে। নইলে সবই কথার কথা হয়ে দাঁড়ায়। তাই গীতায় আছে—

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতো ইহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।"

তাঁতে যুক্ত না হ'য়ে শুধু পারিপার্শ্বিক নিয়ে থাকতে গেলে আমার ব্যক্তিত্ব ছিন্নবিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো হ'য়ে যাবে ভিতরের নানা প্রবৃত্তি ও বাইরের নানা আকর্ষণ ও সংঘাতের মধ্যে পড়ে। আমি দিশেহারা হ'য়ে পড়ব। আমি আছি, আমার ব্যথা আছে। তাই মানুষের কষ্টটাও বোধ করতে পারি নিজের দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে। শুধু বুঝলাম, সাধ্যমত প্রতিকারের চেষ্টা করিলাম না, সেবা সহানুভূতির গান গেয়ে বেড়ালাম। তাতে কিন্তু আমি কপট হ'য়ে পড়ব। আমার ব্যক্তিত্ব অসঙ্গতিবহুল হ'য়ে পড়বে। আবার সেবা করলাম, ইষ্টপ্রতিষ্ঠা করলাম না, তাতে যে সেবা পেল, তার আত্মশক্তির জাগরণ হ'লো না, প্রকৃত মঙ্গল হ'লো না, আবার আমার মধ্যে হয়ত আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি মাথা তোলা দিল। সবটাই অনর্থের কারণ হ'য়ে দাঁড়াল। ভগবানের জন্য যা' নয়, তাইই ব্যর্থ, শুধু ব্যর্থ নয়, দুর্ভোগ ও বন্ধনের স্রষ্টা।

যতীনদা—কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ আত্মকেন্দ্রিকতা। আত্মকেন্দ্রিকতা মানেই প্রবৃত্তি-কেন্দ্রিকতা। আপনি আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে যদি ছেলেপেলেদের জন্য খুব করেন, তারা আত্মকেন্দ্রিক হবেই কি হবে। আপনার বৃদ্ধবয়সে হয়ত দেখবেন তারা আপনার দিকে ফিরেও চাইছে না, অথচ বৌ-ছেলেপেলের জন্য পাগল। এই রকম আর কি।

ভক্তসঙ্গের উপকারিতা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃত ভক্ত ভগবান ছাড়া আর কিছু চায় না, আর কিছু বোঝে না। তাঁর বিরহে সে চিরব্যথিত। আমরা যাই পাই না কেন, তিনি ছাড়া অন্য কিছুতে আমাদের বুক ভরে না। ভরবার নয়, তাই ভরে না। মানুষের অন্তর এন্তার ফাঁকা। তা' কিছুতেই ভরে কিনা, সেই চেষ্টায় সে কত কী করে! কিন্তু কিছুতেই শান্তি পায় না, তৃপ্তি পায় না, তার অস্থিরতা যায় না। ভক্ত কিন্তু তার ইষ্টের মধ্যে সব কিছু পায়। তিনিই যে সারাৎসার, এই সার বুঝ সে বুঝে ফেলে। তাই কামনাবাসনার হয়রানি থেকে সে অনেকখানি রেহাই পায়। এতেই আসে শান্তি। তাই অন্যেও তার সঙ্গ করে শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ পায়। মানুষ জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে অহর্নিশ এই-ই চাইছে! সৎসঙ্গ বলে, তার মানে সত্তার সঙ্গ। সত্তা সচ্চিদানন্দময়। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যিনি তাঁকে মানুষ খোঁজে নিজের সত্তাটাকে অটুট ও বর্দ্ধনশীল ক'রে তুলতে। যখন মানুষ দেখে যে তার চিরআপন বলতে কেউ নেই, সে একক ও নিঃসঙ্গ, তখন তার ক্ষুদ্র সত্তা আলিঙ্গন করতে চায় মহাসত্তাকে, অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দকে। আমরা ভগবানের নাম কই মদনমোহন। মদনের যত মত্ততা ও দৌরাত্ম্য আছে সবই তাঁর কাছে গেলে মোহিত হ'য়ে যায়। মদন তখন তার চরিতার্থতা খুঁজে পায়। মদনকে ভস্ম ক'রে লাভ কী ? তাকে বরং মদনমোহনের সেবক ক'রে সার্থক করাই ত ভাল। তিনি আমার মদনমোহন, তিনি আমার নটবর, তিনি আমার নবকিশোর, যারা চায় তাদেরও তিনি মদনমোহন, নটবর ও নবকিশোর। আর যারা না চায় তাদেরও তিনি মদনমোহন, তাদেরও তিনি নটবর, তাদেরও তিনি নবকিশোর। তিনি দুবাহু বাড়িয়েই আছেন সবাইকে আলিঙ্গন ক'রে বুকে তুলে নেবার জন্য। মানুষ চায় না ব'লে বুঝতে পারে না। এতে তাঁর চোখেও জল ঝরে, বিমুখ মানুষগুলিও মর্ম্মপীড়ায় মরে।

উক্ত মা—আজ চায় না, হয়ত পরে চাইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না চাইলেও তাঁকে ছাড়া উপায় নেই মানুষের। তাঁর দয়ার

মধ্যে থেকেই তাঁকে চাই না। তাঁর দেওয়া সবকিছু নিয়েই বেঁচে আছি। আমার সত্তায় যা' কিছু আছে সব তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। অথচ তাঁকে চাই না। এই না চাওয়ার মধ্যে আছে অকৃতজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা কিছু নেই, অজ্ঞতা আছে। তাঁকে না চাওয়ার ফলে অভিজ্ঞতা না বেড়ে অজ্ঞতা বাড়ে। কারণ complex-এর (প্রবৃত্তির) দ্বারা coloured (রঙিন) থাকায়, correct self analysis (নির্ভুল আত্মবিশ্লেষণ) হয় না। কেষ্টদা সেইদিন কী বলছিল ত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ?

প্রফুল্ল—"Experience is not what happens to a man, but experience is what a man does with what happens to him."

(একজন মানুষের জীবনে যা' ঘটে তা' তার অভিজ্ঞতা নয়। তার জীবনে যা' ঘটে তা' দিয়ে সে যা' করে, সেইটে হলো তার অভিজ্ঞতা)।

নবাগতা মা বললেন—আমার পায়ে ব্যথা। তা সত্ত্বেও উইলিয়মস টাউন থেকে এই পর্য্যন্ত হেঁটে এসেছি আপনাকে দর্শন ও প্রণাম করব বলে, আপনার শ্রীমুখ থেকে কিছু শুনব বলে। কতদিন থেকে আপনার কথা শুনছি। আজ দর্শন পেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর দরদভরে বললেন—মা! তোর পায় কী হয়েছে ?

মা—কঠিন ধরনের বাত।

শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত সবার দিকে চেয়ে ব্যাকুলভাবে বললেন—মায়ের কী অসাধারণ আগ্রহ ভেবে দেখ। অতখানি ব্যথা নিয়ে হেঁটে চলে এসেছে। ওর থেকে অনেক কম ব্যথা হ'লেও হয়তো আমি আসতে পারতাম না।

মা যতি-আশ্রমে আসার সময় কয়েকজন বাধা দিয়ে বলেছিলেন—এখানে মায়েদের প্রবেশ নিষেধ। তাঁর আকুল আগ্রহ দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর আদেশ দেন যাতে তাঁকে আসতে দেওয়া হয়।

সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে মাটি আক্ষেপের সুরে বলেন—মেয়েদের প্রতি সব সময়ই অবিচার। তাদের যে কত দুর্ভোগ ভুগতে হয়, তার ঠিক নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েদের প্রকৃতিই সহ্য করা। তাদের অতখানি সহ্যগুণ আছে বলেই দুনিয়া টিকে আছে। তারা যদি সহ্য না করত, মহাবিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হ'য়ে যেত।

উক্ত মা মাতৃজাতি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সশ্রদ্ধ উক্তি শুনে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। তাঁর চোখ ছলছল করতে লাগল। একটু পরে তিনি বললেন—মহাপুরুষদের যে পরশপাথরের সঙ্গে তুলনা করে কেন তা' আজ বুঝলাম।

ক্ষণিকের জন্য আপনার কাছে এসে যেন চোখ খুলে গেল, মন ভ'রে গেল। বড় শান্তি পেলাম। আপনার আশীর্ব্বাদ চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা বললাম এই আমার আশীর্ব্বাদ। ঐভাবে পরমপিতার পথে চললেই সব ঠিক হ'য়ে যায়।

এরপর উক্ত মা প্রণাম ক'রে বিদায় নিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এরপর ফুরসতমত আসিস। তবে হেঁটে নয়, রিকশা বা অন্য কিছুতে। বাড়ি ফেরার পথেও হেঁটে যাস না। দরকার হ'লে বল—আমি কোন ব্যবস্থা ক'রে দিই।

উক্ত মা—তার কোন দরকার হবে না। আমি একটা রিকশা করে নেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরেব্বাবা! তুই একটা ডাকাত! ঐ পা নিয়ে হেঁটে আসলি।

মা—আপনার দয়ায় পেরেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার টানই তোমাকে দয়া করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মুখস্থ সেগুনগাছটার দিকে বিষণ্ণভাবে চেয়ে আছেন। চৈত্রের শেষ। বাইরের রোদে যেন আগুনের হল্কা। মাঝে মাঝে উথালপাথাল পাগলা হাওয়া বইছে। দুটি একটি ক'রে জীর্ণ পাতা ঝরছে। গাছে যে শুকনো পাতাগুলি আছে তার কোনটা যে কখন ঝ'রে পড়বে তার ঠিক নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাতে আপনি মগ্ন। কয়েক মিনিট এইভাবে কাটলো। উপস্থিত যাঁরা, তাঁরা ভাবছেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের মনটা হঠাৎ এত খারাপ হ'য়ে গেল কেন?

এমন সময় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে দয়াল গভীর ব্যথা ও সমবেদনার সুরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বললেন—ঐ পাতাটা জীর্ণ হয়েছে। বুড়ো হয়েছে আমার মত। হয়ত এখনই স্খলিত হ'য়ে পড়বে। এরও ত মন আছে, feeling (বোধ) আছে। খ'সে পড়ার মুহূর্তে এর মনটা কেমন করতে থাকবে, ভেবে দেখেছ?

কালিদাসদা—গাছটারও লাগবে ত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারও লাগবে, তবে তার এক যাবে, আর হবে। কত কচি-পাতা গজাবে আবার।

প্রফুল্ল—সন্তানদের প্রতি এত টান হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ত্রীর প্রতি অনুগতির ভিতর দিয়ে আসে সন্তানে রতি। আবার সন্তানের প্রতি টান হয় না, যদি তার জন্য কিছু করা না থাকে। তাছাড়া, তোমার যদি তোমার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার টান না থাকে এবং তারও যদি

তোমার উপর সশ্রদ্ধ টান না থাকে, কামের চরিতার্থতা-সাধনই যদি দাম্পত্য জীবনে মুখ্য হয়, তা হ'লে সন্তানেরও পিতামাতার প্রতি প্রকৃত ভাব, ভক্তি, ভালবাসা গজায় কমই। আবার পিতামাতার প্রতি সন্তানের যদি নেশা না থাকে, তাহ'লে তাদের আত্মবিকাশ ও চারিত্রিক সঙ্গতি ব্যাহত হয়। হয়ত তথাকথিত উন্নতি করতে পারে, কিন্তু জীবনে সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। আত্মসংযম ও আত্মসমর্পণ তাদের পক্ষে দুরূহ হয়। তাই তারা শান্তি, আনন্দ, সন্তোষ, সার্থকতা ও আত্মপ্রসাদের মুখ দেখতে পায় না বললেই হয়।

প্রফুল্ল—ছেলেবেলা থেকে সাধুসঙ্গ ক'রে যতটুকু শুনেছি ও বুঝেছি তাতে ত আমার বদ্ধজীবের মত জীবনযাপন করা উচিত ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঔচিত্য, অনৌচিত্যের বিচার করবে কে? তোমার পছন্দ আছে, যেমন পছন্দ তেমন করেছ।

প্রফুল্ল—ঠিকমত হচ্ছে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষেত্র আছে, আবাদ করিনি। বহু আগাছা জন্মে গেছে। এখন খুব ভাল ক'রে চাষ করা লাগবে। আগাছাগুলি নিড়েন দিয়ে তুলে ফেলে ভাল ফসল ফলানর জন্য যা' যা' করার তা' করা লাগবে। একটুও বেখেয়াল হ'লে বা ঢিলে দিলে চলবে না। লেগে থাকাটা খুব বড় কথা। জানপ্রাণ দিয়ে একাগ্রমনে পরমপিতার দিকে এগুতে হবে।

প্রফুল্ল—কতদিনে এই চলনা স্বভাবগত হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার চলার তোড় যেমন, তার তেমনি সময় লাগে।

প্রফুল্ল—তাঁর কৃপা ত চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর কৃপা আছেই। তোমার চাওয়াটা ও করাটা যত নাছোড়বান্দা, কৃপার উপলব্ধি তত ত্বরিত। মায়ের ছেলের উপর টান থাকেই, যে ছেলে যত মাতৃভক্ত, সে ততটা তা' অনুভব করতে পারে।

ব্যাপার কেমন! মায়ের কোলে জন্মালাম, মা-বাপের অতন্দ্র স্নেহযত্নে বড় হলাম। তাদের কোলে দিনগুলি কাটলো ভাল। ভাইবোনদের নিয়ে একসঙ্গে বড় হলাম, তাদের আপন ব'লে ভাবতে শিখলাম। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শী সবার সঙ্গে কত হৃদ্য সম্বন্ধ গজিয়ে উঠল। উপযুক্ত হ'য়ে বিয়ে করলাম। স্ত্রীর প্রেমালাপে মোহিনীমায়ায় মুগ্ধ হলাম। তার খুশির জন্য আপনজনদের পর করে দিতে লাগলাম। পরে বৌ এবং ছেলেমেয়েই আমার কাছে হ'য়ে দাঁড়ালো আমার ত্রিভুবন। আমার স্বার্থান্ধ চলনের ফলে ছেলেমেয়েও হ'য়ে উঠলো আত্মকেন্দ্রিক। তারাও পরে মা চেনে না, বাবা চেনে না। বৌয়ের

কাছে ভেড়া বনার নীটফল কী দাঁড়ালো ? হ'লো এই, তার দাবি আছে, আমার উপর দায়দায়িত্ব নেই, দরদ নেই আমার উপর। যখন আমি অক্ষম তখনও সে তার দাবীর তোড় সমানেই চালিয়ে যাচ্ছে। আজীবন ভূতের বেগার খাটলাম। শেষকালে দেখলাম আমার কেউ নেই, আমি একেবারে একা। উৎসকে বাদ দিলে এই পরিণতি অনিবার্য্য।

শরৎদা—ভগবানের সঙ্গে যে আমার নিত্যসম্পর্ক এবং তাঁকে ভালবাসলে যে আমি অনন্তকাল আনন্দে থাকতে পারি এবং চতুর্ব্বর্গলাভে সব দিক দিয়ে সার্থক হ'তে পারি, তার সাক্ষ্য কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্মৃতিবাহী চেতনা ছাড়া পথ নাই। তা হ'লে সব মনে থাকে। তবে আছি যখন, বাঁচাই লাগবে কাউকে ধরে, যিনি আমার সত্তাকে ষোল আনা জাগিয়ে দিতে পারেন। তাঁকেই আঁকড়ে ধরব সবচেয়ে আপন ব'লে। আর সে কেবল তিনিই। সদ্‌গুরু তাঁরই প্রতীক। তাঁকে আপন ব'লে ধরলে, পৃথিবীতে কেউ পর থাকে না। তাঁর প্রীত্যর্থে প্রত্যেকের প্রতি যথাযোগ্য করণীয় করতেই হয়।

শরৎদা—কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীকেই নিজের সত্তা বলে মনে করে, তা হ'লে তাতেই কি তার জীবন সম্পূর্ণ সার্থক হ'তে পারে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বামীর প্রতি ভক্তি প্রশংসনীয়। তবে স্বামী যদি ইষ্টমুখী না হয়, তাহ'লে উভয়েরই মুশকিল। কলুর চোখবান্ধা বলদের মত সংসারচক্রে ঘুরে ঘুরে হয়রান হওয়া ছাড়া তাদের আর কোন কাজের কাজ হয় না। সার্থকতার সন্ধান মেলে না। নানা কামনায় বদ্ধ হয়ে থাকে।

এরপর গান ধরলেন—

ওরা চাহিতে জানে না দয়াময় !
চাহে ধনজন আয়ু আরোগ্য বিজয়।
করুণার সিন্ধুকূলে বসিয়া মনের ভুলে
এক বিন্দু বারি তুলে মুখে নাহি লয়।

রজনীকান্তের এই গানটি গাইতে গাইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবেগে অঝোরে অশ্রুবিসর্জ্জন করতে লাগলেন। গান আর গাওয়া হলো না।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর পশ্চিমদিকের মাঠে এসে একখানি চেয়ারে বসেছেন পশ্চিমাস্য হ'য়ে। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত রশ্মি তাঁর চোখে-মুখে এসে পড়ায় তাঁকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে। তিনি তন্ময় হ'য়ে প্রকৃতির সান্ধ্যশোভা সন্দর্শন করছেন। দূরে ডিগরিয়া পাহাড় ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তিতে

দণ্ডায়মান। আকাশ, আলো, বাতাস, উন্মুক্ত বিশাল তরঙ্গায়িত প্রান্তর, বালু-শয্যায় শায়িত দারোয়া নদী, সবই যেন এখন মোহমধুর লাগছে। কাছে আছেন পূজনীয় বড়দা। সুশীলদা (বসু), কাশীদা (রায়চৌধুরী) ও সরোজিনী মাও সঙ্গে এসেছেন গাড়ু, গামছা, তামাক, টিকে, সুপারির কৌটা, গড়গড়া, জলের ঘটি, দাঁতখোটা ইত্যাদি সহ। সংকলয়িতাও খাতা, কলম নিয়ে উপস্থিত। কিছু সময় নীরবে কাটল। সবাই যেন ধ্যানরত।

শ্রীশ্রীঠাকুর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে নিজে থেকেই বললেন—মানুষকে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়ে চালিয়ে চালিয়ে এমন ক'রে দিতে হয় যাতে সে ত চলেই এবং অন্যকেও চালনা করতে পারে।

বড়দা—তা'তে আবার নিত্য ওষুধ খাবার মত বদভ্যাস হ'তে পারে, ওষুধ না হ'লে যেন চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমটা কিছু induction (প্রবোধনা) লাগেই।

প্রফুল্ল—চালিয়ে চালিয়ে তাহ'লে প্রত্যেকটা মানুষকে কি একসময় স্বতঃচলৎ-শীল ও অপরের চালক ক'রে তোলা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেপেলেকে হাত ধরে ধরে হাঁটায়। হাঁটার শক্তিটা আছে ভিতরে। তাই হাত ধরে ধরে হাঁটালে হাঁটা শেখে। যে শক্তিটা ভিতরে আছে তাকে উস্কিয়ে দেওয়া লাগে। চালক হওয়ার মত সামর্থ্য যাদের ভিতর আছে, কিছুটা চালিয়ে নিয়ে তাদের ভিতরের সেই সামর্থ্য উস্কে দিতে হয়। চলতে চলতে চলার আনন্দ টের পায়। সেই আনন্দে তখন নিজে থেকে ত চলেই, আবার অন্যকেও চলৎশীল ক'রে তোলার তাগিদ বোধ করে। তার কারণ, সেটা তার জন্মগত সংস্কারের মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু ভিতরের এই সম্ভাব্যতা না থাকলে হয় না।

প্রফুল্ল—আমার শরীর সুস্থ না থাকায়, আমার করণীয় যেগুলি, সবগুলি সময়মত করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য মনে একটা উদ্বেগ লেগেই থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উদ্বেগ ভাল না, উদ্যম ভাল। উদ্বেগের পিছনে একটা negative (নেতিবাচক) ভাব থাকে, শঙ্কা থাকে। উদ্যমে nerve (স্নায়ু)-গুলি চেতে ওঠে। মাতালের মত হয়, উদ্যমের নেশায় স্ফূর্ত্তিতে কাজ করে, শরীরমুখিনতা থাকে না। ইষ্টানুগ কর্ম্মমুখর উদ্যম থাকলে অনেকসময় আধিব্যাধির দিকে খেয়ালই থাকে না। আবার উদ্যম থাকলে শরীরটাও তেমনি চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। উদ্যমটা হওয়া চাই concentric (সুকেন্দ্রিক)। ইষ্ট যদি তোমার যথাসর্ব্বস্ব হন, তখন সেই প্রবল টানের তোড়ে তোমার ভিতর তদনুগ molecular ও cellular

change (আণবিক ও কোষগত পরিবর্ত্তন) আসবে, physical adjustment (শারীরবিন্যাস)-ও হবে তেমনতর। যেমন একটা দেশী গরুর যদি ভাল ষাঁড় দিয়ে breeding (গর্ভসঞ্চার) করান হয়, তাহ'লে সেই বীজকে nurture (পোষণ) দিতে গিয়ে তার এতখানি physical development (শারীরিক উন্নতি) হয়, যে তার দুধের পরিমাণ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের চেহারা-টেহারা ভাল হ'য়ে যায়। ভেবে দেখ কামের উদ্দীপন হ'লে কেমন হয়। কামের সঙ্গে সঙ্গে চোখ, নাক, কান, মুখ, ভঙ্গী সবই যেন সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিলাভ করে ওঠে তন্মুহূর্ত্তে। ইষ্টার্থপূরণী আগ্রহ ও উদ্যম থাকলে শরীরও রোগটোগ অতিক্রম ক'রে যায়। সে কোন limitation (সীমাবদ্ধতা বা অসামর্থ্য) মানতে চায় না। তাকে সে আমলই দেয় না। তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী, কামই বা কী? সে কোন negative (নেতিবাচক) ভাবকে প্রশ্রয় দিতে নারাজ। আমি আগে যখন কাজকর্ম্ম করেছি, আমার কোন উদ্বেগ ছিল না। যা' পারতাম ক'রে যেতাম—স্ফূর্ত্তিতে উদ্যমে। অবশ্য উদ্বেগ যদি উদ্যমকে বাড়িয়ে দেখ, সেখানে কোন কথা নেই। কাজ করতে গেলে, সে উদ্বেগ থাকেই। ঐ উদ্বেগই নিয়ে যায় উৎকর্ষে। তাছাড়া সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে সহযোগী সৃষ্টি করা লাগে, নচেৎ suffer করতে (দুর্ভোগ ভুগতে) হয়।

নরেনদা—সব সময় নাম করার সুবিধা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব সময় নাম করলে একটা concentric attitude (সুকেন্দ্রিক মনোভাব) হয়। নাম করছেন আর কাম করছেন। তাতে আপনি কাজে গুলিয়ে যাবেন না, obsessed (অভিভূতিগ্রস্ত) হবেন না, কাজের above (ঊর্দ্ধে) থাকতে পারবেন, nerve (স্নায়ু)-গুলিও উদ্দীপ্ত হ'য়ে থাকবে। কারণ, আপনি অনবরত একটা fine exercise (সূক্ষ্ম অনুশীলন)-এর উপর আছেন। আবার সব সময় এই রকম নাম করা, ব'সে নামধ্যান করাকেও সাহায্য করে। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস-ব্যবহারকেও consciously (সচেতনভাবে) adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগে। যজন মানে নিজে habituated (অভ্যস্ত) হওয়া—সব দিক দিয়ে—সর্ব্বতোভাবে।

কালিদাসদা—'কালে নানবচ্ছেদাৎ' মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্ত কথাটা কী?

প্রফুল্ল—স এব পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালে নানবচ্ছেদাৎ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বরকল্প পুরুষ কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হন না? তাঁরা পূর্ব্বাপর এক অখণ্ড ধারা বহন ক'রে চলেন। পূর্ব্বতনকে অধিকার ক'রেই পরবর্ত্তী

প্রেরিতের আবির্ভাব হয়। বর্ত্তমান প্রেরিতের মধ্যে পূর্ব্বগামীরা ত থাকেনই, তাছাড়া তাঁর মধ্যে থাকে তাঁদের যুগোপযোগী পরিপূরণ। একই ধারা বর্ত্তমান মহাপুরুষের মধ্যে পূর্ণতর পরিণতি লাভ করে। সেই হিসাবে তিনি পূর্ব্বতনদেরও গুরু। আবার বর্ত্তমান মহাপুরুষের গুরুস্থানীয় হবেন তিনি, যিনি ভবিষ্যতে তাঁরই নবকলেবররূপে আবির্ভূত হবেন অর্থাৎ তিনিই যখন নবীনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবেন। একজনই আসছেন। আদৎকথা পরবর্ত্তী হলেন পূর্ব্বতনের যুগোপযোগী বিবর্ত্তিত রূপ।

শরৎদা—এখন আপনি আছেন, আমরা দেখছি। ঠিক এই সময়ই আপনি কি বহুদূরে কোথাও উপস্থিত থাকতে পারেন, যাতে সেখানকার লোক আপনাকে দেখতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের একটা physical body (পাঞ্চভৌতিক শরীর) ও একটা mental body (মানসিক শরীর) থাকে। আমি হয়ত এখানে থেকেও by will (ইচ্ছার সাহায্যে) বার্ম্মা চ'লে গেলাম। যারা in tune (সমভাবসম্পন্ন) তারা আমাকে দেখতে পাবে, আর যারা passive (নির্লিপ্ত) অর্থাৎ যারা কোন প্রবৃত্তি দ্বারা অভিভূত নয়, তারাও পারবে দেখতে, কিন্তু যারা প্রবৃত্তি-অভিভূত, তারা পারবে না।

কালিদাসদা—ভারত ত একদিন ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ইত্যাদি সব দিক দিয়ে কত উন্নত ছিল, সেদেশের আজ এমন দুরবস্থা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি দেশ পরাধীন হ'য়ে যায়, এবং কৃষ্টিগত অনুশীলন ও অভ্যুদয় ব্যাহত হয়, তাহ'লে ওলট পালট হ'য়ে যায়। অবশ্য আমাদের পরাধীনতার জন্যও আমরাই দায়ী।

শরৎদা—কোন ঋত্বিক যদি বেঠিকভাবে চলে, তবে তাদের দেওয়া দীক্ষাগুলিতে কি খারাপ কিছু হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেভাবে ব'লে দিয়েছি, সেইভাবে দিলে যে নেবে তার কোন ক্ষতি হবে না। তবে যে দেবে তার ক্ষতি হ'তে পারে।

শরৎদা—প্রত্যেকটা দীক্ষার সময় আপনি উপস্থিত থাকেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের অন্তঃকরণে যদি উপস্থিত থাকি, তাহ'লে থাকি।

২৬শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৫৫ (ইং ৯।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় মাটিতে পাতা বিছানায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসেছেন। সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), যতীনদা (দাস), নরেনদা

(মিত্র), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সংকলয়িতা, হাউজারম্যানদা, হেনরী প্রভৃতি কাছে আছেন। যেন এক আনন্দের হাট বসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে এক অলোকসামান্য প্রসন্নতা প্রস্ফুটিত হ'য়ে আছে। তাঁকে দর্শন ক'রেই মনে হয় জীবন সার্থক। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে আপনমনে গাইছেন—

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে !
কঠিনে মেশে না সে, মেশে তরল হ'লে।
অবিরাম হ'য়ে নত, চ'লে যাও নদীর মত,
কলকলে অবিরত "জয় জগদীশ" বলে।
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, মোহপাড় ভাঙ্গ সমূলে
চেও না কোনও কূলে, শুধু নেচে গেয়ে যাও রে চ'লে।
সে জলে নাইবে যারা, থাকবে না মৃত্যু জরা
পানে পিপাসে যাবে, ময়লা যাবে ধু'লে।
যারা সাঁতার ভুলে নামতে পারে
(তাদের) টেনে নে' যাও একেবারে,
ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে' যাও, সেই পরিণাম সিন্ধুজলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবে গরগর, মাতোয়ারা। আকুল-করা তাঁর দৃষ্টি। মহাভাবের আবেশে তাঁর শ্রীঅঙ্গ ঈষৎ দুলছে। এই অবস্থা দর্শনে মানুষের মনে স্বতঃই ঈশ্বর-পিপাসা জাগে। আলুনি লাগে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য ও ভোগসুখ।

হেনরি ত বাংলা কিছু বোঝেন না। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য অভিব্যক্তি দেখে অন্য সবার মত তাঁর মধ্যেও একটা ভাবাবেশের সঞ্চার হ'লো। সবার চোখ ছলছল করতে লাগল।

ননীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তে জলের ঘটি তুলে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনাভাবে জলপান করলেন। ননীদা তামাকও সেজে দিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর গড়গড়ার নল টানতে লাগলেন কিন্তু তখনও তাঁর মন যেন অন্য কোন রাজ্যে বিরাজমান।

পরে পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি সম্বন্ধে আলোচনা উঠতে নিম্নলিখিতরূপ স্থির ক'রে দিলেন।

পঞ্চবর্হি

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম শরণম্।
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধা ঋষয়ঃ শরণম্।
তদ্‌বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্।

তদনুবৃত্তো বর্ণাশ্রমাচারঃ শরণম্ ।
পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্ ।
এতদেবার্য্যায়নম্
এষ এব সদ্ধর্ম্ম ঃ
এতদেব শাশ্বতং শরণ্যম্ ।

সপ্তার্চ্চি

১। নোপাস্যমন্যদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্ ।
২। তথাগতাস্তদ্‌বার্ত্তিকা অভেদাঃ ।
৩। তথাগতাগ্র্যোহি বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতা বিশিষ্ট-বিশেষ বিগ্রহ ঃ ।
৪। তদনুকূলশাসনং হ্যনুসর্ত্তব্যং নেতরৎ ।
৫। শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবাঃ শ্রদ্ধেয়াঃ নাপোহ্যাঃ ।
৬। সদাচারা বর্ণাশ্রমানুগজীবনবর্দ্ধনা নিত্যং পালনীয়াঃ ।
৭। সবর্ণানুলোম বিহিতযৌনাচারাঃ
পরমোৎকর্ষহেতবঃ স্বভাব পরিধবংসিনস্তু তদিতর-যৌনাচারাঃ।

পরবর্ত্তীকালে অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই দুই এক জায়গায় ভাষার পরিবর্ত্তন ক'রে দেন ।

সুশীলদা—সব জিনিসটা এইভাবে সূত্রাকারে দেওয়া থাকলে লোকের পক্ষে খুব সুবিধা হবে ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমবেত প্রার্থনাকালে নিত্য এটা আবৃত্তি করতে থাকলে লোকের মাথায় গেঁথে যাবে । তাই, অনুসৃতির মধ্যে এটা দিয়ে দেওয়া ভাল । এই জিনিসটা যেমন হিন্দুত্বের সার-সংকলন, তেমনি এটা সার্ব্বজনীন । কারণ, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জীবনবৃদ্ধিকামী লোকেরা তাদের মত ক'রে এরই রকমফের মেনে চলে, অবশ্য in essence (তাৎপর্য্যতঃ) ।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিনী রোডের পশ্চিমদিকে মাঠে এসে বসেছেন । পশ্চিমাস্য হ'য়ে বসায় অস্তগামী সূর্য্যের লালিমা এসে পড়েছে তাঁর মুখে । তাই তাঁর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এখন তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ মনোলোভা মনে হচ্ছে । ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তাঁর পানে ।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্ল, কাশীদা (রায়চৌধুরী), প্রবোধদা (মিত্র) ও শৈলেনদা

(ভট্টাচার্য্য)-কে জিজ্ঞাসা করলেন—বিয়ে করা সম্বন্ধে তোদের কার কী মনোভাব বলতো !

প্রফুল্ল, প্রবোধদা এবং শৈলেনদা স্ব-স্ব বক্তব্য বলার পর কাশীদা বললেন—ইচ্ছা হ'লেও ঘরে ঘরে যা দেখি তাতে ভয় করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন জিনিসটাই একপেশে ভাবে দেখা ভাল না। তাতে সত্য নির্দ্ধারণ করা যায় না।

এমন সময় বর্দ্ধমানের জমিদার যামিনীবাবু (সিংহ) আর এক ভদ্রলোক-সহ এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

তাঁদের একটি নীচু বেঞ্চে বসতে দেওয়া হ'লো। যামিনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—ধর্ম্ম জিনিসটা কী ?

ধর্ম্ম মানে সেই চলনে চলা যাতে সপরিবেশ নিজের বাঁচাবাড়া পরিপোষিত হয়। পরিবেশসহ বাঁচাবাড়ার পথে না চললে একক বাঁচা ও বাড়া যায় না।

যামিনীবাবু—নাম করার কথা শুনি, নাম করলেই কি মানুষের উদ্ধার হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটো কথা শোনা যায়। একটা কথা হলো—"কোটি জন্ম করে যদি নামসংকীর্ত্তন, তথাপি না পায় কেহ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" আবার আছে—"একবার হরি নামে যত পাপ হরে, জীবের নাহিক সাধ্য তত পাপ করে।" তার মানে শুধু mechanically (যান্ত্রিকভাবে) নাম করলে হয় না। নাম করতে হয় অনুরাগ নিয়ে, নামটা জীবন্ত হয় অনুরাগে। অনুরাগ-সম্বলিত নামে আমাদের সত্তা ইষ্টঝোঁকা হয়। ইষ্টের উপর নেশা যত বাড়ে ততই মানুষ প্রবৃত্তির উর্দ্ধে ওঠে। তাকেই বলা যায় উদ্ধার হওয়া। যাহোক, নামের একটা সুফল আছেই। আগ্রহ সহকারে ক্রমাগত নাম করতে করতে অনুরাগ জাগেই। নাম যেমন করতে হয়, ইষ্টের প্রীতিজনক কর্ম্মও তেমনি করতে হয়।

যামিনীবাবু—শুনেছি ধর্ম্মপথে অগ্রসর হ'তে গেলে যুগধর্ম্ম অনুসরণ করতে হয়। এক এক যুগের যুগধর্ম্ম কি এক রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিভিন্ন যুগধর্ম্মের রকমারির মধ্যে যত যাই কিছু থাকুক না কেন, সব যুগেই অনুরাগ-যুক্ত ইষ্টানুসরণ আছেই কি আছে। সেটা বাদ দিলে ধর্ম্মের ধৃতি-ই থাকে না।

যামিনীবাবু—সুকৃতি না থাকলে নাকি ধর্ম্ম লাভ হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকৃতি থাকলে normal tendency (স্বাভাবিক ঝোঁক) হয়। কিন্তু সুকৃতি না থাকলেও সাধুসঙ্গ ও সৎসঙ্গের আওতায় থাকতে থাকতে, শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে ঐদিকে ঝোঁক যায়। কিছু না করার থেকে সদ্‌গুরুর কাছ

থেকে নাম নিয়ে অনুরাগ না থাকলেও চেষ্টা করেও নাম করার অভ্যাস করা ভাল, ঐ করতে করতে হয়তো একদিন টক করে লেগে গেল, ভাব জেগে গেল। তখন নাম না করলেই ভাল লাগে না।

নামে যেন মনটাকে টানে। তাই বলে, ধর্ম্মের ভানও ভাল।

তবে ধর্ম্মের সাধন করা লাগবে সাংসারিক জীবনের মধ্য দিয়ে। তা' প্রয়োগ করতে হবে যাবতীয় দৈনন্দিন কর্ম্মে, নচেৎ আমরা educated (শিক্ষিত) হ'তে পারব না। এক কথায়, ধর্ম্ম আমাদের সত্তায় গ্রথিত হ'তে পারবে না। ধর্ম্মের নীতি পরিপালিত হওয়া চাই চাকর-বাকর, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার, পারিপার্শ্বিক, সবার সঙ্গে ব্যবহারে। কাজে-কর্ম্মে, চলায়-ফেরায়, হাটে-বাজারে, বিষয়-কর্ম্মে, সামাজিক ব্যাপারে সবটার মধ্যে তা' অটুট থাকা চাই। ঐভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে নিজেকে ইষ্টের নীতি-বিধি অনুযায়ী adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে করতে character (চরিত্র)টাই অমন হয়ে যায়। তোমার চলা দেখেই মানুষ টের পায়, ধর্ম্ম যখন মানুষকে চালায় তার চলনাটা তখন কেমন হয়। ধর্ম্মের দ্যুতি তখন ঠিকরে বেরোয় তোমার চলার ভিতর দিয়ে। তার জেল্লা আলাদা।

যামিনীবাবু—যেন-তেন-প্রকারেণ ক্ষমতার আসন দখল করাই আজকের যুগ-ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যুগধর্ম্ম যদি মেনে চলি, তবে যুগের যেমন অবস্থা, আমারও তেমন অবস্থা হবে। যুগধর্ম্ম মানে আমি বুঝি, যুগকে যা সুষ্ঠুভাবে ধরে রাখে ও অভ্যুত্থানের পথে নিয়ে চলে সেই চর্য্যা। ধর্ম্মের মধ্যেই আছে বাঁচা এবং বাড়া। প্রবৃত্তি-স্রোতে গা ঢেলে দিলে বাঁচাও হয় না, বাড়াও হয় না। তার জন্য লাগে সেই আদর্শের প্রতি নতি, যাঁর মধ্যে বাঁচাবাড়ার নীতি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। যুগধর্ম্ম যেমন আছে, তেমনি আছে বয়োধর্ম্ম। যেমন আপনার বৃদ্ধ বয়সে এখন যে খাদ্য দরকার তা' না খেয়ে অন্যরকম খেলে চলবে না। এটা আবার ভিন্ন ভিন্ন বৃদ্ধের পক্ষে আলাদা-আলাদা ধরনের হ'তে পারে, কিন্তু এই পার্থক্যের মধ্যেও মূল উদ্দিষ্ট হ'লো সত্তাসম্বর্দ্ধনা—তা' যার যেমন ক'রে হয়।

যামিনীবাবু—একটা কথা আছে—"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।"

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে 'তর্কে বহুদূর,' যুক্তিতে বহুদূর নয় কিন্তু। তর্ক মানে নিজের ego (অহং)-এর support-এ (সমর্থনে) argument (বাদানুবাদ)। যুক্তি হ'লো সত্যনিরূপণার্থে বিহিত বিচার। বিশ্বাস মানে সংশয়ের পারে যাওয়া, বিগত প্রশ্ন হওয়া, solved (সমাহিত) অবস্থা লাভ করা।

'বিশ্বাস ক'রে ঠকলাম' মানে অলস হ'য়ে অন্যের উপর নির্ভর ক'রে কাজ

হাসিল করতে চাইলাম, বাস্তবে দেখেশুনে নিঃসংশয় ও নিষ্প্রশ্ন হ'লাম না। তেমন করলে ঠকার প্রশ্ন আসে না। আমাকে যদি কেউ ঠকিয়ে থাকে, তার মানে আমিই আমাকে ঠকালাম নিজ বুদ্ধির দোষে এবং নিজের গাফিলতিতে। ঠকানটা যেমন অপরাধ, ঠকাটা তার চাইতে কম অপরাধের নয়। আসল-নকল যে ধরতে পারে না, সে নকল মালই। ডাকাতরা যেমন দল বাঁধে ডাকাতি করার জন্য, ঠগরাও তেমনি দল বাঁধে পুরোদমে ঠগবাজী চালাবার জন্য। তারা কিন্তু পরস্পরকে বিশ্বাস করে না। সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি যাকে বলে।

এরপর পূজনীয় বড়দা, সুশীলদা (বসু) ও সন্তোষদা (রায়) সহ আসলেন।

যামিনীবাবু এখন বিদায় নিলেন।

সম্প্রতি সন্তোষদার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। তিনি বিষন্নভাবে নিজের মানসিক অবস্থার কথা জ্ঞাপন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর সহানুভূতির সাথে বললেন—মানুষ বড় অসহায়।

সুশীলদা—মানুষ বৃত্তির ঘোরে যখন চলে তখন একরকম। মনে হয় যেন মহাশক্তিমান মানুষ। কিন্তু সেই মানুষই হয়ত কোন আঘাত পেলে একেবারে দিশেহারা হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃত্তির পথে যে চলে, নিজ প্রবৃত্তির সায় থাকায় তাতে একটা প্রবল উৎসাহ বোধ করে। বিকারের রোগীও কত জোরের পরিচয় দেয়। কিন্তু সে ত ব্যাধিরই গহীন অবস্থা। ব্যাধি ত মানুষকে দুর্ব্বল বই সবল করে না। তবু বিকারের রোগীর কত আস্ফালন দেখা যায়। বৃত্তিঘোরে চলাটা সুস্থ চলন নয়। ও বিকারের রকমফের। তাই অত বড়ফট্টাই। নচেৎ বৃত্তির কবলে থেকে কেউ কিন্তু প্রকৃত সুখ পায় না।

সন্তোষদা—আমার শান্তি হবে কীসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুঁটোয় বেঁধে চলতে হয়। তাঁতে টান যদি বাড়ে, নেশা যদি পেয়ে বসে, তখন দুঃখ-কষ্ট কিছু করতে পারে না।

সন্তোষদা—সেত অনায়াসলভ্য জিনিস নয় !

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনায়াসলভ্য জিনিস দুনিয়ায় কী আছে ? সবই ত লেগে-বেঁধে অভ্যাস করতে করতে হয়, তবে আমি ত দুনিয়ায় টিকে থাকতে চাই। তার জন্য একটা মূল সম্বল চাই ত, নইলে সংসারের ঘূর্ণি-ঘোরে পড়ে ত ছাতু-ছাতু হ'য়ে যাবো। এত দেখলাম, শুনলাম, ঘা-গুঁতো খেলাম, ঠকলাম, তবুও সত্তার স্বার্থ কী তা বুঝলাম না। আমার জীবন-সর্বস্ব কিন্তু সেই একজন। তাঁকে যে-নামেই অভিহিত কর না কেন, সে আলাদা কথা, কিন্তু সেই তাঁতে হাড়ভাঙ্গা টান না

হ'লে কিছুতেই তুমি শান্তি পাবে না, স্বস্তি পাবে না, শক্তি পাবে না, এ একেবারে অকাট্য কথা। তাই স্বামীজী বলেছেন—"সেই এক তরী করে পারাপার।" সেই তরী হল ভালবাসা। তা যেখানে-সেখানে ন্যস্ত করলে চলবে না। যিনি তোমার জীবনের কাণ্ডারী তাঁকেই কায়মনোবাক্যে ভালবাসতে হবে, তাঁর পথেই চলতে হবে। এছাড়া অন্য পথ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বারান্দায় পাতা শুভ্র শয্যায় বসেছেন। নরেনদা (মিত্র), যতীনদা (দাস), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্তী), কালিদাসদা (মজুমদার), যন্তা সুরেনদা (বিশ্বাস), সংকলয়িতা প্রভৃতি কাছে আছেন। ননীদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক, জল, সুপারি ইত্যাদি দিচ্ছেন।

বেশী বা কম কথা বলা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিতরে ভিতরে নাম করলে কথাগুলি short (সংক্ষিপ্ত) ও convincing (প্রত্যয়দীপী) হয়। তাতে যে কারও সঙ্গে কথা বলা হয় না বা কাউকে এড়িয়ে চলা হয় তা' কিন্তু নয়। ফলকথা, আমি যে কথাগুলি বলেছি সেগুলি চরিত্রে মুদ্রিত ক'রে ফেল এবং সক্রিয় জীবনে সেগুলি এস্তামাল করতে থাক। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিরখ-পরখ চালাও, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে চল। করতে করতে দেখবে আমার নির্দ্দেশগুলি তোমাদের স্বভাবগত হয়ে গেছে। তখন বুদ্ধি করে করা লাগবে না, normally (স্বভাবতই) চলাটা ওইরকম হবে। এটা করবে তপ-তৎপরতার সাথে। আর কতকগুলি সদাচার আছে পালন করো—গায়ে গায়ে বসে খেও না, নিজেদের কাজ যথাসম্ভব নিজেরা করো। সামর্থ্য থাকতে অন্যের সাহায্য নেব না, পারি ত অন্যেরটা ক'রে দেব, এই বুদ্ধি রাখা লাগে। আর একটা কথা, যেখানে যে-কোন ব্যাপারই ঘটুক না কেন, যে যাই করুক না কেন, তা' কেন ঘটল এবং সে কেন তা' করল, ধীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করো। দেখো দোষ দেখে যেন দুষ্ট হতে না হয় এবং অবস্থার ঊর্ধ্বে থেকে যাতে সবকিছু adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পার।

ননীদা—ইষ্টনিন্দার ক্ষেত্রে মন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Unbalanced (সাম্যহারা) হ'লে remedy (প্রতিকার) করতে পারবে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ অসৎ জিনিসটা চায় না অন্তরে। সে যে অসৎ এটা ভাবতেও ভাল লাগে না তার। নিজের অসৎ চরিত্রের সমর্থনে সে একজন বড়লোককেও হয়ত তার নিজের মত ক'রে Paint (অঙ্কন) করে। কারণ তাঁর হয়ত বহু গুণের সঙ্গে সামান্য কিছু দোষ আছে যেদিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে

মিল দেখা যায়। কিন্তু এটা ভেবে দেখে না যে উক্ত বিশিষ্ট লোকটির যেসব মহৎ গুণ আছে তা হয়ত তার কিছুই নেইকো। তার এই রকমটা থেকে অনুমান ক'রে পরপর প্রশ্ন করা যায়, আপনি বলুন তো আপনি এই করেন কিনা, আপনি এই করেন কিনা? এইভাবে প্রশ্ন ক'রে ক'রে যদি জ্যোতিষীর মত তার স্বরূপকে তার সামনে তুলে ধর তখন কিন্তু সে একেবারে ছাতু-ছাতু হ'য়ে যাবে, অথচ তোমাকে তার বলবার কিছু থাকবে না। চটাও ভাল না, আপোষরক্ষা করাও ভাল না। বুদ্ধি থাকবে তাকে কীভাবে win (জয়) করব, convince (প্রত্যয়দীপ্ত) করব। কায়দামত কথা বলতে জানলে যে-প্রবৃত্তির উপর দাঁড়িয়ে একজন বাজে কথা বলে, তার কদর্য্যতা তার কাছে ধরা পড়ে, তখন সে নিজের ভুল বুঝে লজ্জিত হয়। যেই কারও কথা শুনে তুমি তার রোগ অর্থাৎ দুর্বলতা ধ'রে ফেললে অমনি সে তোমার হাতে এসে গেল। তখন খেলিয়ে-খেলিয়ে তুমি তার মুখ দিয়ে তোমার প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত বের ক'রে নিতে পার। আমার সামনে আমার প্রেষ্ঠের নিন্দা করল, তার মানে আমি যেমনই হই আমার দীপ্তি তার হৃদয়কে আকৃষ্ট করতে পারেনি, আলোকিত করতে পারেনি। এইভাবে বলতে হয়—আপনি যে এসব কথা বলছেন, এইভাবে বলাটা আপনার পক্ষে খারাপ, আমার পক্ষে খারাপ, দেশের পক্ষে খারাপ, দশের পক্ষে খারাপ, জাতির পক্ষে খারাপ, জগতের পক্ষে খারাপ। মানুষ দাঁড়ায় ইষ্ট ও কৃষ্টির উপর। ইষ্ট না হয় নাই মানলেন, কিন্তু কৃষ্টি বাদ দিয়ে দাঁড়াবেন কোথায়? এইরকমে কতভাবে যে বলা যায় তার কি লেখাজোখা আছে? সত্তা যখন কথা ব'লে ওঠে, সে কথা হয় দুর্ব্বার। বীর্য্যবান বিশ্বাস থেকে মানুষ যে কথা কয়, সে-কথা শুনে পাহাড় ট'লে যায়, মানুষ গ'লে যায়। বিশ্বাসের সে গভীর স্তরে কেউ না গেলে এসব কথা কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যায় না···। আবার আদর্শের কথা সরাসরি না তুলে এভাবেও বলা চলে—তুমিও বাঁচতে চাও, আমিও বাঁচতে চাই। তোমার, আমার এবং সবার বাঁচাবাড়ার যা' পোষক তা' ignore (উপেক্ষা) ক'রে লাভ কী? তা' বাদ দিয়ে আমরা দাঁড়াবোই বা কী ক'রে? মানুষের স্বার্থের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়, তখন সে পট্‌ ক'রে বোঝে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন। তামাক খেতে খেতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে সবার দিকে চেয়ে অন্তরঙ্গভাবে বললেন—যা' ব'লে দিয়েছি ওইভাবে এঁকে ফেল চরিত্রটা, সত্তাটাকে ওইরকম ক'রে ফেলে দাও। সাবধান ক'রে দিচ্ছি, মেয়েলোকের কাছে বেশি ঘেঁষবে না, honourable distance (সম্মান-যোগ্য দূরত্ব) বজায় রেখে চলবে। এটা ধ'রেই রেখ যে তোমাদের নিজেদের

দুর্ব্বলতা আছে। তাই, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। একটা কথা মনে রাখবে—বৃত্তিগুলি সব সময় অহংকে টেনে নিয়ে তাদের দাঁড়ায় চালাতে চায় আমাদেরকে। তা' কখনও হ'তে দেবে না। সত্তা যেন সবসময় বৃত্তি থেকে আলগা থাকে, ঊর্ধ্বে থাকে এবং ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার্থে প্রয়োজনমত বৃত্তিগুলিকে কাজে লাগায়। বৃত্তিগুলি আমাদের নোকর, আমরা যেন কিছুতেই তাদের নোকর না বনি। ব্যক্তিত্বের মূলই এখানে।

সুরেনদা সংসারের জন্য করণীয় সম্পর্কে প্রশ্নাদি করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চকিতে সোজা হ'য়ে ব'সে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দুর্ব্বার আবেগে উচ্চৈঃস্বরে বললেন—তোমাদের প্রথম কাজ নিজেদের তৈরী করা। সংসার যদি গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়েও যায় এবং তা' দেখতে গিয়ে যদি তোমাদের সাধনা ব্যাহত হয় তাহ'লে তখন সংসারকে উপেক্ষা ক'রেও আমি তোমাদের যে-ব্রতে ব্রতী হ'তে বলেছি তা' উদ্‌যাপন করবেই কি করবে। তোমার এই ভাব থাকা চাই—আমি চাই প্রকৃত যতি হ'তে। চাই, চাই, নিতান্তই এটা চাই। এটা আমাকে হ'তেই হবে। এসেছি যখন perfect (নিখুঁত) যতি হ'য়েই উঠব।···এমন হওয়া লাগবে যে একটা যতির glow-তে (জেল্লায়) সারা ভারত, সারা পৃথিবী স্বর্গ হ'য়ে ফুটে উঠবে। এটা আমার পাগলামিও হ'তে পারে। কিন্তু আমি ভাবি, পৃথিবীতে বহু হোমরাচোমরা থাকতে পারে যাদের কাছে তোমরা হয়ত ঘেঁসতেও পার না, কিন্তু আমার মনে হয়, সেই হোমরাচোমরাদের সত্তাসম্বর্দ্ধনার পোষণা হয়ত তোমাদেরই যোগাতে হবে। তাই পিছটানের দিকে চাইলে তোমারা নিজেদেরও বঞ্চিত করবে, আমাকেও বঞ্চিত করবে এবং জগৎকেও বঞ্চিত করবে। যতি যখন হয়েছ সে বেইমানি তোমরা করতে পার না। আমি চাই আমার চাইতেও বড় হও তোমরা, আমি একটা pivot (কীলক) মাত্র। এটা একটা সৌজন্য নয়, ভদ্রতা নয়, এটা আমার অন্তরের কথা। আমি খুশী হব, তোমাদের তেমন দেখতে যেমনটা দেখে আমার জীবন কৃতার্থ হ'য়ে যায়।

তোমরা আমাকে ভালবাস, আমাকে সেবা করতে চাও, কিন্তু সেই glow (দীপ্তি) ফুটে ওঠা চাই তোমাদের সমগ্র চরিত্রে আর তা' অভিব্যক্তি লাভ করা চাই আমাকে আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক, সর্ব্বভাবে সব দিক দিয়ে বাস্তবে পরিপূরণ, পরিরক্ষণ ও পরিপোষণ করতে। আমার সমগ্রতায় আমাকে ধরতে হবে, বুঝতে হবে, বহন করতে হবে তোমাদের। এই করতে গিয়েই integrated (সংহত) হ'য়ে উঠবে তোমরা, powerful (শক্তিমান) হ'য়ে উঠবে তোমরা। তোমাদের সেই সংহত চরিত্র-শক্তি দিয়ে দুনিয়াকে নূতনভাবে গ'ড়ে তুলতে পারবে।

নইলে আমাকে হাজার সোনার সিংহাসন ক'রে দিলেও আমি তাতে খুশী হ'তে পারব না। মনে থাকে যেন আমার চাওয়াটা।

যতীনদা—আমি দেখছি, এখানে আসার পর আমার family (সংসার) আগের থেকে ভাল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Family (সংসার) better (আরও ভাল)-ই থাক আর worse (আরও খারাপ)-ই থাক সেটা কোনো বিবেচনার বিষয় নয়। আপনি যে-জন্য এখানে এসেছেন একমাত্র সেই কাজ হাসিল করার দিকেই আপনার সারা দেহ-মন-প্রাণ সক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীভূত থাকবে। তা' যদি করতে পারেন, পরিবারের জন্য আপনার ভাবতেই হবে না। পরিবারের প্রয়োজন তখন ভূতে যোগাবে। পরমপিতার সেবা করতে গিয়ে বারবার পিছন পানে চাইলে অখণ্ডভাবে সেবা ও সাধনা করা হয় না। আর আপনি যেখানে কর্ত্তা সেজে সংসার দেখতে যান, সেখানে পরমপিতারও কিন্তু কিছু করবার থাকে না। নিজে কর্ত্তাগিরি ছাড়েন, একমাত্র কর্ত্তা যিনি তাঁর হাতে সব কর্ত্তৃত্ব সঁপে দিয়ে বিলকুল তাঁতেই তন্ময় হ'য়ে যান। আপনি ত সন্ন্যাসী, আপনি ত তাঁরই। এই ত আপনার জীবনযজ্ঞ।

২৭শে চৈত্র, রবিবার, ১৩৫৫ (ইং ১০।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। গরম কাল, তাই সূর্য্য ওঠার পরই বেশ একটা গরম আবহাওয়া টের পাওয়া যাচ্ছে। শরৎদা (হালদার), কালিদাসদা (মজুমদার), নরেনদা (মিত্র), যতীনদা (দাস), সুরেনদা (বিশ্বাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি কাছে আছেন।

হাউজারম্যানদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন। সেই প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল।

কথা-প্রসঙ্গে হাউজারম্যানদা বললেন—আমাদের মন তো ঠিক থাকে না। মন ঠিক রাখা যায় কি ভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রধান জিনিস হল ইষ্টনিষ্ঠা। ইষ্টচিন্তা থেকে কখনও চ্যুত হ'তে নেই, নাম সর্বদা করতে হয়। ইষ্টানুগ চিন্তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বাস্তব কর্মে সব সময় নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হয়। এতে স্বভাবতই মন ভালো থাকে। ইষ্টপূরণী কর্মোদ্যম ও উৎসাহ কমে গেলে মনে depression (অবসাদ) আসে। প্রবৃত্তি যখন চেপে ধরে তখন তার প্রভাবে মন চঞ্চল ও মলিন হ'য়ে ওঠে। তখন

ঔষধ হলো ইষ্টানুরাগ যাতে প্রবল হয় তেমন ভাবে ভাবা, বলা ও করা। ভাবমুখী থাকতে হয়, ইষ্টঝোঁকা হ'য়ে থাকতে হয়। এমন কতকগুলি কথা মনে মনে আওড়াতে হয়, গুন গুন ক'রে এমন কতকগুলি গান গাইতে হয়, যাতে মন চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। আর মন ঠিক রাখার একটা মস্ত উপায় হ'লো যাজন।

সুরেনদা—মনের ভাবটা সর্বদা উদ্দীপ্ত রাখা যায় কি ভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—থিয়েটারে যেমন প্রয়োজন মত mood (মনের ভাব) সৃষ্টি ক'রে নেয় তেমনি করতে হয়। ভিতরের ভাব যেমনই থাক না কেন মন উদ্দীপ্ত থাকলে যেমনতর বলে, করে, চেষ্টা ক'রে ঐরকম বলতে ও করতে থাকলে আস্তে আস্তে মনটা উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। বাইরের বলা, করা, ভাব-ভঙ্গী, মেজাজ যেমন হয় ভিতরের ভাবটাও তদনুগ হ'য়ে ওঠে।

সুরেনদা—কোন আত্মীয়-স্বজন বিপন্ন হ'য়ে যদি আমার সম্বন্ধে চিন্তা করে, আমার মনের উপর তার কি কোন প্রভাব পড়ে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রভাব পড়তে পারে যদি তোমার মন কোন উচ্চ বিষয়ে ব্যাপৃত না থাকে। মন যদি সদ্বিষয়ে সক্রিয় ভাবে মগ্ন থাকে তখন ঐসব প্রভাবে বিচলিত হয় না।

সুরেনদা—বাইরে কাজকর্ম করছি এমন সময় হয়ত বাড়ির কোন বিপদের খবর পেলাম, তখন যদি খুব নাম করি তাতে কি তার প্রতিকার হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামটাম করলে বুদ্ধি একটা বেরিয়ে যায়, যা হয়ত প্রতিকারের সহায়ক। আবার তুমি দূরে নিবিষ্টভাবে নামরত হয়ে আছ এমন সময় যেখান থেকে হোক কেউ যদি তোমার চিন্তা করে তাতে তার মনও নামমুখী হওয়ার প্রেরণা পায়। সেই প্রেরণা অনুযায়ী যদি সে নাম করে তাতে সেও উপকৃত হ'তে পারে। তাই নিজের ও অপরের মঙ্গলের জন্য সব সময় নামময় থাকা ভাল। তবে এই সব বুদ্ধি থেকে নাম করার থেকে, আমি যেমন বলেছি তেমনটি হ'য়ে ওঠার জন্য যা' যা' করার তা' করতে থাকাই ভাল। তাতে ভিতরের রঙ ধরে। সর্বদা ভাবতে হয়—আমি ঠাকুরের, তাঁর মনোমত হয়ে ওঠাই আমার জীবনের একমাত্র সাধ্য। চলেই দেখ না এই ভাবে। তখন আবোল-তাবোল চিন্তা করার ফুরসত পাবে না। ঠাকুরই তোমাকে পেয়ে বসবেন। তাতে যে কি সুখ, কতবড় সার্থকতা তা' ব'লে বোঝান যায় না। আমার ধারণা ওকেই বলে বৈকুণ্ঠে বাস। বৈকুণ্ঠে বাস মানে বিগত কুণ্ঠ হয়ে বিষ্ণুলোকে বাস। বিষ্ণুলোক মানে ব্যাপ্তিলোক, ইষ্টস্বার্থী হলেই মানুষ সর্বস্বার্থী হ'য়ে ওঠে। সক্রিয় সুকেন্দ্রিক ভাবে সর্বস্বার্থী হ'য়ে চলাকেই বলে ব্রাহ্মীস্থিতি। আমি কি জন্য কি বলি তা' তলিয়ে ভেবে দেখো ও

করতে চেষ্টা করো। তখন নিজের পরিবার তো দূরের কথা শত শত পরিবারের ত্রাণকর্তা হ'য়ে উঠতে পারবে এই তুমি।

উপস্থিত সবাই তন্ময় হ'য়ে শুনছেন তাঁর শ্রীমুখের অমৃত বাণী।

হাউজারম্যানদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সব কথা ঠিক ঠিক বুঝতে না পারলেও মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছেন তাঁর ভাবমধুর প্রেম-মুখপানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদার দিকে চেয়ে মধুর হেসে বললেন—Be a sanyasi (সন্ন্যাসী হও)।

হাউজারম্যানদা ভাবে ডগমগ হ'য়ে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—হেনরী কেমন ?

হাউজারম্যানদা—ওর রকমের ঠিক নেই। নাম-ধ্যান ঠিক মত করে না। মেজাজ এই ভাল এই খারাপ, কখনও কখনও হঠাৎ রেগে যায়। যখন ভাল তখন আবার খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম-ধ্যান প্রভৃতি নিজে করতে হয় আর সঙ্গে সঙ্গে করাতে হয়, তাও চাপাচাপি ক'রে নয়। Example is better than precept (দৃষ্টান্ত উপদেশের থেকে ভাল)। তুমি যদি নাম-ধ্যানে আনন্দ পাও, শান্তি পাও, তুমি মুখে কিছু না বললেও তোমার expression (অভিব্যক্তি) দেখেই সে তা' বুঝতে পারবে। তখন সে স্বতঃই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নাম-ধ্যানের দিকে ঝুঁকবে। সমগ্র সত্তা দিয়ে আমরা ভাল কিছু যদি করি তখন তার দ্যুতি ফুটে ওঠে আমাদের চরিত্রে। তখন আমাদের সান্নিধ্যে এসে মানুষ, অন্তত সশ্রদ্ধ যারা, তারা অল্পবিস্তর moulded (নিয়ন্ত্রিত) হয়ই, কারণ আমাদের করাটা দেখে কি না ! তখন কথাও বেরয় তেমনি, তেমনভাবে বলি যাতে মানুষ শোনে, কারণ তার পেছনে practical realisation (বাস্তব অনুভূতি) থাকে। তাই কথাগুলিও হয় exalting ও elating (উন্নয়নী ও উদ্দীপনী)। নিজেকে angel-like (দেবতুল্য) ক'রে ফেলতে হয়, তখন কত জনকে ঠিক করতে পারবে।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অহং-এর tussle (দ্বন্দ্ব) হ'লে মানুষ rigid (অনমনীয়) হ'য়ে যায়। Speak exaltingly but not prickingly (প্রেরণাপূর্ণ কথা বল কিন্তু খোঁচা দিয়ে কথা বলো না)।

হাউজারম্যানদা—নাম করতে বসলে অনেক সময় আমাদের অস্বস্তি হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Complex (বৃত্তি)-গুলি মাথায় jumbled up-হয়ে (জড়া পাকিয়ে) থাকে। সেগুলি যে ভিতরে ঐভাবে আছে, সাধারণতঃ আমরা সে বিষয়ে খুব সচেতন থাকি না। কিন্তু নাম করার সময় ওগুলি উত্তাল হ'য়ে জেগে

ওঠে। আমরা ওগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হই। কিন্তু বিবেক-সম্মতভাবে ওদের পুষে রাখতে প্রবৃত্তি হয় না। মনে হয় ওগুলির হাত থেকে নিস্তার পেলে বেঁচে যেতাম। এই দ্বন্দ্ব যখন জাগে তখন কিছুটা nervous (ভীত) হ'য়ে পড়ি। ভাবি ওগুলি হয়ত ছাড়তে হবে। কিন্তু ওগুলি ছেড়ে বাঁচব কি নিয়ে, সে সময় তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি—ভাবি বাঁচলাম। কিন্তু ও বাঁচা যে বাঁচা নয় তা আর বুঝি না। প্রবৃত্তির হুলবুলি থাকলে একটা অস্থির রকম হয়। মন যেন বিরক্ত, বিশৃঙ্খল ও চঞ্চলই হ'য়ে থাকে। অবাধভাবে প্রবৃত্তিগুলির চাহিদা মেটাতে পারলে তখন একটা হাসি-খুশি ভাব থাকে। আবার প্রবৃত্তিগুলির কাছে আত্মসমর্পণ করার পরই আসে একটা ঘোরতর অবসাদ। মন সুস্থ-স্বস্থ, শান্ত ও হৃষ্ট থাকে কমই।

প্রফুল্ল—একজন হয়ত আপনার জন্য খুব করে দেয় থোয়, কিন্তু পাঁচ মিনিট এক জায়গায় স্থির হ'য়ে বসতে পারে না। সে কেমন? টান না থাকলে ত অমন ক'রে করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরকম টান আবার পট্ ক'রে একটা মেয়ে মানুষের পরও চ'লে যেতে পারে।

সুশীলদা (বসু)—ওই করতে করতে তা' থেকে একাগ্রতা আসতে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যেস করা লাগে।

সুশীলদা—বাইরের কাজ যে যতই করুক, নাম-ধ্যান তাহ'লে প্রত্যেকেরই করা লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। নাম-ধ্যান না করলে মানুষ নিজের কাছে নিজে ত ধরাই পড়ে না। দোষগুলি যদি ধরতেই না পারে, তাহ'লে সংশোধন-ই বা করবে কি ভাবে?

হাউজারম্যানদা—Climatic condition (আবহাওয়ার অবস্থা)-ও ত মানুষের মনকে প্রভাবিত করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ তা' করে, তবে আমাদের থাকতে হবে সমস্ত অবস্থার ঊর্ধ্বে।

প্রফুল্ল—আদর্শ ছাড়াও ত বহু বিশিষ্ট লোককে খুব দায়িত্বপূর্ণ অনেক কাজ কর্ম্ম করতে দেখা যায়। আত্মনিয়ন্ত্রণ না থাকলে তাঁরা এসব করেন কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহু লোক প্রবৃত্তির মধ্যেই ঘোরে এবং প্রবৃত্তি অনুপাতিক adjustment (বিন্যাস) করে। কিন্তু তাতে normal adjustment (স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ)-এর কাজ হয় না। তাদের brain (মস্তিষ্ক)-ও হয় তেমনতর। কাজে

সাফল্যও আসে সেই পর্য্যায়ের।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুম থেকে ওঠার পর বড়াল-বাংলোর সামনের বারান্দায় চৌকিতে শুভ্র শয্যায় এসে বসেছেন।

কালিদাসীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক, জল, সুপুরি দিচ্ছেন। কখনও বা ঝাড়ন দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছেন। সুশীলদা (বসু), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), গোপেনদা (রায়), আদিনাথদা (মজুমদার), দেবুভাই (বাগ্‌চি), জয়ন্তদা (বিশ্বাস), মহেন্দ্রদা (হালদার), সেবাদি, রেণুমা, মঙ্গলামা, হেমপ্রভামা, রানীমা, গৌরীমা, ননীমা প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত।

যামিনীদা জিজ্ঞাসা করলেন—দুনিয়ার মূল উপাদান matter (বস্তু) না Spirit (শক্তি) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Matter (বস্তু) হয়ত সবই matter (বস্তু) Spirit (শক্তি) হয়ত সবই spirit (শক্তি)। matter (বস্তু)-কে ভেঙ্গে energy (শক্তি) করা যায়, energy (শক্তি) matter-এ (বস্তুতে) পরিণত হয়। দুই নাই একই আছে তাকে আমরা যে নামেই অভিহিত করি না কেন।

যামিনীদা—সমাজে শোষণ আছে তাই আজকাল অনেকেই সাম্যবাদ চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃত বড় যারা তারা বড় হয়েছে service (সেবা) দিয়ে। শোষণ ক'রে বড় হ'লে তারাও শোষিত হয়, তার কারণ কেউই শোষিত হতে চায় না। যে শোষিত হয় সে শোষকের বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ায়ই। দীর্ঘকাল মানুষ শোষণ বরদাস্ত করে না। সেবা দিয়ে মানুষকে বড় ক'রে তুলতে যোগ্যতা লাগে, আর যোগ্যতাই মানুষের পরম সম্বল। যে সেবা না দিয়ে শোষণ করতে চায় তার জীবনীয় যোগ্যতা দিন দিন শীর্ণ হ'তে থাকে। তাছাড়া পরিবেশও তার প্রতিকূল হ'তে থাকে, তাই সে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। অপরের ক্ষতি করে বাঁচতে চাইলে আমাদের বাঁচাটাও ধীরে ধীরে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পথেই চলে। ধনিকও শ্রমিক ছাড়া আর কিছু নয়কো। শ্রমিকদের মধ্যে কৌশলী ও কৃতী যারা তারাই যোগ্যতা ও বুদ্ধির বলে ধীরে ধীরে অল্পবিস্তর ধনী হ'য়ে ওঠে। যোগ্যতার তারতম্য আছেই তাই যোগ্যতার তারতম্য অনুযায়ী অর্থসম্পদের তারতম্য হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই ব'লে কারও কিন্তু অপরকে শোষণ করার অধিকার নেই। আমি ভাবি প্রত্যেকটি শ্রমিক যাতে ক্রমোন্নতি পরায়ণ হ'য়ে ওঠে তাই করাই ভাল, প্রত্যেককে বড় করার তালে থাকাই ভাল। বড়কে খাটো করার চেষ্টা ভাল না, বড় যে তারও উচিত ছোটকে বড় ক'রে তোলার চেষ্টা করা। তা' যদি সে না করে তার বড়ত্ব বেশী দিন অক্ষুন্ন থাকে না। আবার বলছি বৈশিষ্ট্য ও

যোগ্যতা অনুযায়ী অবস্থার তারতম্য থাকা অসমীচীন নয়। যোগ্যতার স্বীকৃতি ও সমাদর না থাকলে মানুষের ভিতর যোগ্যতা লাভের জন্য effort (প্রযত্ন) থাকে না। কিন্তু প্রত্যেকের বাঁচা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে রাষ্ট্র ও সমাজের সেদিকে লক্ষ্য থাকা দরকার। আগে আমাদের দেশের বৈশ্যরা প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জ্জন করতো। কিন্তু ধর্ম্মার্থে অর্থাৎ ইষ্ট, কৃষ্টি ও বাঁচাবাড়ার স্বার্থে বিহিত দান তাদের অবশ্য করণীয় ছিল। তা' না করলে রাজা কিংবা ব্রাহ্মণ তাকে বাধ্য করতো তা' করতে। নইলে সমাজ তার প্রতিকার করত। এমনকি কৃপণ ও কর্তব্যপরাঙ্মুখ ধনীর কাছ থেকে ধন কেড়ে নিয়ে লোককল্যাণার্থে ব্যয় করার অধিকার ছিল ব্রাহ্মণের। সমাজই ব্রাহ্মণের পিছনে থেকে, তাঁকে দিয়ে এই কাজ করাত। এই ব্রাহ্মণরা ছিলেন প্রকৃত লোকস্বার্থী। লোকস্বার্থই ছিল তাঁদের আত্মস্বার্থের সামিল। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থকে তাঁরা আমলই দিতেন না, তাই আজও ব্রাহ্মণদের এত সম্মান।

আমার ঋত্বিকরা যদি ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে গ'ড়ে ওঠে তাহ'লে তারাই পারে সব ঢেলে সাজাতে। মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ না হয় তাহ'লে যে ব্যবস্থাই করা যাক না কেন তার মধ্যে গলদ ঢুকে যায়। মানুষ যদি মানুষের আপন না হয় তাহ'লে কিছুতেই কিন্তু মানুষের দুঃখ ঘুচবে না। আদর্শনিষ্ঠ যারা, তারা কিন্তু আদর্শের প্রীত্যর্থে অপরের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠেই।

যামিনীদা—সবাই ত চায় পেট বাঁচাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই আগে জান্ বাঁচাও সত্তাকে বাঁচাও, তাতে পেটও থাকবে সবই থাকবে। জীবন ও সত্তাকে বাদ দিয়ে পেট বাঁচাতে গেলে পেটও বাঁচবে না জীবন ও সত্তাও বাঁচবে না। আমাদের দৃষ্টি যদি পেট সর্ব্বস্ব হয় তবে পেটকে বাঁচাবার যোগ্যতাও থাকবে না আমাদের, তাতে সবাই মারা পড়ব। প্রত্যেকে চাইবে অন্যকে খতম ক'রে বাঁচতে, তাতে যে পারস্পরিকতার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকের বাঁচাটা সাবুদ হয়, তা' আর হ'তে পারবে না। পরস্পর খেয়োখেয়ি ক'রে প্রত্যেকেই সাবাড়ের পথে এগুতে থাকবে। তাই প্রথমে লাগে ধর্ম্ম যার মূল হল বাঁচিয়ে বাঁচা, অপরকে বড় ক'রে বড় হওয়া।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সত্তা সম্বর্দ্ধনী তপস্যা থেকে বিরত হ'য়ে যেই মানুষ অলস উপভোগে গা ঢেলে দেয় তখন থেকেই তার শক্তি ও যোগ্যতা ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পেতে থাকে। এমনতর মানুষ দিন দিন পরনির্ভরশীল হ'তে বাধ্য হয়। অপরের উপর নির্ভরশীল হ'য়েও তাদের ভোগলোলুপতা যায় না। যোগ্যতা না থাকলেও তাদের প্রয়োজনের সীমা থাকে না। এ জন্য তারা স্বভাবতই

তাচ্ছিল্যের পাত্র হ'য়ে ওঠে। তাই আমি বলেছি—কাজ না ক'রে যে জন পায়, সেই পাওয়াতেই তারে খায়। আমাদের দেশে একটা কথা আছে—"বসে থাকার চেয়ে বেগার খাটা ভাল।" কথাটা খুব ঠিক। আমাদের এখানে অনেকে আছে যারা সাধ্যমত নিজেদের exert করে না (খাটায় না)। এটা খুব ক্ষতিকর।

এরপর বিবাহ সম্বন্ধে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নারী ও পুরুষের কুল-সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি যদি সঙ্গতিশীল ও পারস্পরিক-ভাবে সত্তা পোষণী না হয় তাহ'লে সন্তান ভাল হ'তে পারে না। সবর্ণ বিয়ের মধ্যেও কটা বিয়ে যে ঠিক মত হয়, তা' বলা যায় না। তাই আজ দেশে মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুশীলদা—এর উপায় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃত ঘটকরা যাতে সমাজে বিহিত মর্য্যাদা পায় তার ব্যবস্থা করা লাগবে। আর আপনাদের ঋষি হ'য়ে উঠতে হবে।

পুনরায় নামধ্যান সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নামধ্যান করলে একটা deep penetrating (গভীর অন্তর্ভেদী) রকম হয়, shallow (ভালবাসা) থাকে না। সব জিনিসটার পরিমাণটা পর্য্যন্ত চিন্তা করে দেখতে পায়। যাদের চিন্তাধারা সুষ্ঠু ও সঙ্গতিশীল নয়, জানবেন তারা ধ্যান করে না। অন্যে তাদের যেমন বোঝায় তারা সেইভাবে বোঝে। কার কথার মধ্যে ফাঁক কোথায় তা' ধরতে পারে না। এক কথায় তাদের ব্যক্তিত্ব ও মস্তিষ্ক অপরিণত অবস্থায় থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে যতিবৃন্দকে বললেন—Inferiority (হীনম্মন্যতা) ভাল না। ওর সঙ্গে complex (প্রবৃত্তি) থাকেই, ওতে মানুষ খুব কষ্ট পায়। Inferiorty কে আপনারা কখনও প্রশ্রয় দেবেন না।

হীনম্মন্যতা দরুন অনেকে অপরকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি অপরের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করতে না শিখি তাহ'লে অন্যেও আমাদের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করে না।

এর কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

তপের মরকোচই হল
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারকে
নিয়ন্ত্রণী সমাবেশে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ক'রে তোলা—

সক্রিয় উপায়ে,—
যা' সার্থক হ'য়ে উঠে,
আধ্যাত্মজীবনকে উৎকর্ষে উচ্ছল ক'রে তোলে।

বাণীটি দেওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে তা' পড়তে বললেন।

পড়া হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—তাহ'লে এতে একটা cycle (বৃত্ত বা চক্র) complete (সম্পূর্ণ) হ'ল—বাহ্যিক জগতের খুঁটিনাটি থেকে শুরু ক'রে মনোজগতের খুঁটিনাটি নিয়ে, মায় আধ্যাত্মিক জীবনের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত এর মধ্যে রইল। যে কোন sphere (ক্ষেত্রে) ও যে কোন affair (ব্যাপার)-ই এর মধ্যে থাকতে পারে—তা রাজনীতিই হোক, বাগান করাই হোক, ব্যবসাই হোক, সাধন-ভজনই হোক আর যাই কিছুই হোক না কেন। জীবনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই এর মধ্যে এসে পড়ে। তাই এমনতর সামগ্রিক তপস্যা ছাড়া ধর্ম্ম হয় না।

২৮শে চৈত্র, সোমবার, ১৩৫৫ (ইং ১১।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুর পশ্চিমদিকে বড়াল বাংলোর প্রাঙ্গণে একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট। তিনি উপস্থিত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে প্রসন্ন বদনে আলাপ আলোচনা করছেন। তাঁর সান্নিধ্যে প্রত্যেকের অন্তর পরিপ্লুত। সবাই যেন এক অপার শান্তিপারাবারে অবগাহিত হ'য়ে আছেন। মন-প্রাণ এবং সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে তারা সেই পরম সুখদাতাকে অনুভব ও উপভোগ করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাচ্ছলে বললেন— সেই দিন একটা পাঁঠা কেটে নিয়ে যাচ্ছিল আমার সামনে দিয়ে। মনে হচ্ছিল আমাকেই যেন কেটে নিয়ে যাচ্ছে। ঐরকম ক'রে কেটে খায়—অথচ ওরা কিন্তু আমাদেরই মতন, সব বোধ আছে আমাদের মতন।

কালীদা (সেন)—আপনি ত বলেন সব কিছুরই প্রাণ আছে। সেদিক দিয়ে আমরা নিরামিষাশীরা যা' খাই তাতেও ত উদ্ভিদ জগতের প্রাণ নাশ করা দরকার হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর তুমি ভাত খাও, যখন ধান পাকে তখন ধান গাছের জীবন শেষ হ'য়ে আসে। সেই সময় ধান কাটো যাতে সেই মাটিতেই আবার তুমি ধান জন্মাতে পার। এতে তুমি প্রকৃতির পরিপন্থী হও কমই। অবশ্য বেঁচে থাকতে গেলেই কিছুটা হিংসা অনিবার্য্য ভাবে এসে পড়ে। দেখতে হয় সেটা কত কম ক'রে পারা যায়। প্রকৃতির সঙ্গে যদি আমরা সহযোগিতা ক'রে

প্রকৃতিকে পরিপোষণ জুগিয়ে আত্মরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করি তাতে কিন্তু বিশেষ কোন দোষ হয় না।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কথা-প্রসঙ্গে বললেন—গৃহস্থদের কিছু কিছু সঞ্চয় করা দরকার। কারণ সংসারে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। তখন কিছুটা সঞ্চয় না থাকলে বিপন্ন হ'য়ে পড়তে হয়। আবার তাদের নজর রাখা লাগে—পারিপার্শ্বিকের কেউ বিপন্ন হ'লে তাকে যাতে সাধ্যমত সাহায্য করতে পারে। এমন মনোবৃত্তি থাকা ভাল যে পারতপক্ষে আমি পরমুখাপেক্ষী হব না কিন্তু আমার কাছে যদি কেউ সাহায্যপ্রার্থী হয়, তাকেও বিমুখ করব না। এই বুদ্ধি থেকে মানুষের যোগ্যতা বাড়ে। তবে পরিবেশের সঙ্গে এমন বান্ধব-বন্ধন সৃষ্টি করা লাগে, যাতে অনিবার্য্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পরিবেশের সহযোগিতায় নিজের বাঁচা-বাড়াকে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। মানুষের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করাও দূষণীয় কিছু নয়, কিন্তু সব সময় নজর রাখা লাগে যাতে পরিবেশের কাছ থেকে আমাদের নেওয়ার তুলনায় দেওয়া ও করাটা ঢের বেশি হয়। পরিবেশকে উৎসাহ আনন্দ উদ্দীপনা ও বুদ্ধি পরামর্শ যোগানও একটা বাস্তব সেবা। আমাদের চালচলন, ভাব-ভঙ্গী, কথা-বার্তা, ব্যবহার যদি স্বভাবতঃই প্রেরণাসন্দীপী হয়, তাহ'লে আমাদের অজ্ঞাতসারে পরিবেশ আমাদের দিয়ে উপকৃত হয়। ইষ্টপ্রাণ সেবাবুদ্ধি থাকলে, ভালবাসা থাকলে তাকে দিয়ে কত মানুষের যে কত মঙ্গল হয় তা' বলে শেষ করা যায় না। সুগঠিত চরিত্রই হল আসল মাল।

নগেনদা (বসু)—সংসারের লোকের তো অনেক প্রত্যাশা থাকে সংসারের অভিভাবকের উপর। এ অবস্থায় নিবিষ্টভাবে একাগ্র মনে ইষ্টকর্ম্ম করাই ত মুস্কিল হয়ে পড়ে। অভাবের সময় পরিবারের লোক যখন চায় তখন তাদের কিছু কিছু দিতে হয়, নচেৎ ইষ্টকর্ম্মই ব্যাহত হয়। কর্ম্মীর নিজের চাই ক্লেশ সুখপ্রিয়তা আর পরিবারবর্গকেও এমনভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা লাগে, যাতে তাদের মধ্যেও ক্লেশসুখপ্রিয়তা গজায়। তখন তারা কষ্টে কাবু হয় কমই। তবে নিতান্ত প্রয়োজন যা, তা' যোগানই লাগে। কোন কর্ম্মী যদি নিষ্ঠা নিয়ে উপচয়ী ভাবে ইষ্টকর্ম্ম ক'রে চলে তাহ'লে বেশীদিন তার অভাব অভিযোগ থাকেও না।

কাশীদা (রায়চৌধুরী) আশ্রম পারম্পর্য্য সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্মচর্য্য থেকে জীবন শুরু। এর মূল হ'ল গুরুগত প্রাণ হয়ে নিজের চলন চরিত্র ঠিক করা ও শিক্ষিত হয়ে ওঠা, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিবেশকে সেবা করার সামর্থ্য ও যোগ্যতা অর্জ্জন করা। তারপর সমাবর্তন লাভ করে বিধিমত বিবাহ করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য

আশ্রমের training (শিক্ষা)-টা এখানে practically (বাস্তবভাবে) apply (প্রয়োগ) ক'রে জীবন সংগ্রামে কৃতকার্য হ'তে হয়। আগে যা শিখে আসল তার independent application (স্বাধীন প্রয়োগ) হয় এই পর্য্যায়ে। কার জ্ঞানটা কত পাকাপোক্ত, কার চরিত্র কত সুনিয়ন্ত্রিত, তার পরীক্ষা হ'তে থাকে এখানে। গার্হস্থ্য আশ্রম অত্যন্ত মূল্যবান। পরিবারগুলি যদি ভাল ভাবে গ'ড়ে ওঠে, তাহ'লে সেখান থেকে ভাল ভাল মানুষ বের হ'তে পারে, যারা কিনা হয় সমাজের সম্পদ। এর পরে আসে বানপ্রস্থ আশ্রম। বানপ্রস্থ মানে ছোট সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকে বিস্তার লাভ করা। তা থেকে evolve করে (বিবর্তিত হয়) সন্ন্যাস। সন্ন্যাস মানে ইষ্টে নিজেকে সম্যক-ভাবে ন্যস্ত করা। এক কথায় সন্ন্যাসটা হ'ল complete surrender (পূর্ণ আত্মসমর্পণ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর এখানে থেকে উঠে এসে যতি-আশ্রমের সামনের বারান্দায় মাটিতে প্রস্তুত শুভ্রশয্যায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে উপবেশন করলেন। তিনি এখন খুব হাসি-খুশি। তাঁর পূর্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে শরৎদা (হালদার), নরেনদা (মিত্র), যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), কালিদাসদা (মজুমদার), সুরেনদা (বিশ্বাস) প্রভৃতি যতিবৃন্দ উৎসুক হ'য়ে বসে আছেন। সংকলয়িতাও খাতা কলম প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত। ননীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় রত। গরমের দিন ব'লে কালিদাসদা ও নরেনদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পাখা দিয়ে হাওয়া করছেন। কখনও বা যতীনদা ঝাড়ন দিয়ে মাছি তাড়িয়ে দিচ্ছেন। খগেন (মণ্ডল) এসে প্রণাম ক'রে আগ্রহ ভরে দাঁড়িয়ে আছে। মোহনভাই (ব্যানার্জি) এবং ননীমা প্রণামান্তে রান্নাঘরের কাজে কর্ম্মে মনোযোগ দিয়েছেন।

শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—বাইবেলে eunuch for God বলে কথা আছে। Eunuch for God (ভগবানের জন্য নপুংসক) কাকে বলে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মানে ভগবানের জন্য তাদের এতখানি অনুরাগ যে, সেখানে অন্য অনুরাগ ঠাঁই পায় না। তারা ঈশ্বরের জন্য এতই ব্যাকুল হ'য়ে থাকে যে কাম-প্রবৃত্তি তাদের ভেতর মাথা তোলা দেওয়ার অবকাশ পায় না। সে দিকে তাদের মনই যায় না। যৌন ব্যাপারে কার্য্যতঃ তারা ক্লীব। এর মানে এই নয় যে পুরুষত্ব তাদের কিছু কম। পুরুষত্ব তাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও তারা যৌন ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজনই বোধ করে না। তীব্র বৈরাগ্য তাদের স্বভাবগত, তাই তারা চিরকুমার থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হ'তে গেলে মনের কিছুটা আগ্রহ থাকা চাই সেইদিকে। তাই কামকে বলেছে মনসিজ। কিন্তু

তাদের মন ইষ্টে এমনভাবে absorbed (নিবিষ্ট) থাকে যে তা otherwise (অন্যাদিকে) direct (পরিচালিত) করার অবকাশ পায় না। তারা ঈশ্বরীয় ভাবে এত বিভোর থাকে যে কাম-প্রবণতা তা'দিগকে যৌন ব্যাপারে আকৃষ্টই করতে পারে না। এরা হলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। আগের কালে কিছু কিছু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন যারা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ না ক'রে সারাজীবন গুরুসেবা, লোকসেবা, অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও যজন যাজনে অর্থাৎ সাধন তপস্যায় ও ধর্ম্ম সঞ্চারণায় অতিবাহিত করতেন। এদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হোত। তাই ব'লে আদর্শ গৃহস্থ যারা তাদেরও মর্য্যাদা কম ছিল না।

বেলা এগারটা দশ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাণীটি বললেন—

ছোট্ট খাট্টো ব্যাপারে মানুষ যখন
অসংযত হ'য়ে চলে,
তখনকার আচার ব্যবহার দেখেই
বুঝতে পারা যায়—
প্রকৃতিতে সে কি,
দেখে হিসাব ক'রে চলো'—
ঠকবে কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রসঙ্গে বললেন—রাগ ক'রে, অপমানিত হ'য়ে বা স্বার্থ সংঘাতে ও দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের সময় মানুষ কেমনতর ব্যবহার করে তাই দেখে বোঝা যায় ভিতরের মানুষটা কেমন। যারা প্রকৃত ভদ্র ও শিষ্ট তারা রাগের সময় কড়া কথা বললেও ইতরের মত ব্যবহার করে না। প্রবৃত্তি উত্তেজিত হওয়া সত্ত্বেও তারা সম্পূর্ণ আত্মহারা হয় কম, তাদের মাত্রাজ্ঞান ঠিক থাকে। তারা ইষ্ট কৃষ্টি ও সুনীতির বিরোধী কুৎসিত আচরণ বা উক্তি করে কমই। যাদের হীনম্মন্য অহং খুব প্রবল থাকে তারা যে কতখানি খাটো করতে পারে নিজেদের, তার কোন সীমা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালিষষ্ঠীমাকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে সোল্লাসে বললেন—কি রে কালিষষ্ঠী, কোনে যাস ?

কালিষষ্ঠীমা হেসে বললেন—সুশীলদার কাছে একটু দরকার আছে। সেখানে যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমের বারান্দায় বসে নিম্নলিখিত বাণীটি বললেন,

ব্যভিচার সত্তায় যেমন বিক্ষোভ আনতে পারে
তার কামকলুষ প্রবৃত্তিতন্ত্রতার ভিতর দিয়ে
বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত ক'রে,

অমনটি আর কমই আছে ;
এতে মানুষ বিকেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে সহজেই,
বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তি লোভানিতে অভিভূত হয়ে ওঠে,
সামঞ্জস্যহারা একটা সুরহীনম্মন্য গোঁ নিয়ে
বিভ্রান্তির পথে চলতে থাকে—
সত্তাকে শোষণ করতে করতে ;
আর এতে, যে যত বিকৃত
বিকৃতও সে তেমনি—
তার বৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য্যে ;
তাই যদি বাঁচায় সামাল হ'তে চাও,
দুরিত অপনোদন করে
অনতিবিলম্বেই ব্যভিচার প্রবৃত্তিকে
সমূলে উৎপাটন ক'রে ফেল ;
নয়ত বিকট পরিস্থিতি
অন্তরে বাহিরে নারকীয় অভিযানে
তোমাকে খতমের দিকে
টানতে ছাড়বে না—
অবসন্ন, অভিভূত ক'রে।

বাণীটি পড়া হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রসঙ্গে বললেন—ব্যভিচার মানুষকে একেবারে সাবাড় ক'রে দেয়। ব্যভিচার এক বিকট বিশ্বাসঘাতকতা। অবশ্য তারও রকমারি আছে। যারা বেশ্যাসক্ত তাদের দিয়ে সমাজের অত ক্ষতি হয় না, যতটা ক্ষতি হয় গোপন-ব্যভিচার-লিপ্ত শয়তানের দ্বারা। তারা কায়দা কৌশল ক'রে মেয়েদের বিশ্বাস উৎপাদন করে, পরে তাদের নানাভাবে প্রলুব্ধ ক'রে নিজেদের দুষ্ট মতলব হাসিল করে। অনেক বিবাহিত ও অবিবাহিত মেয়ে এবং বাল বিধবাদের এরা সর্ব্বনাশ ক'রে ছেড়ে দেয়। কিন্তু নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য যে বিবাহযোগ্যা কন্যাটির সর্ব্বনাশ সাধন করল তাকে যদি বিবাহ করতে বলা হয় সেখানে হয়ত দায়িত্ব নিতে নারাজ। এমনই বেইমান যে নিজের দোষ হয়ত সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে বসে। মেয়েটিকে হয়ত মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণ ক'রে ছাড়ে। এরকম ক্ষেত্রে কত মেয়ে হয়ত আত্মঘাতী হয়। আবার যাকে নষ্ট করল অথচ বিবাহ করতে রাজী হ'ল না সে মেয়ের অন্যত্র বিবাহ হ'লেও তার মন দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায়

তার সন্তানও ঐ রকম দোটানা মন নিয়ে জন্মাল। এই সব সন্তান সুনিষ্ঠ হতে পারে কমই, তাই তাদের জীবনও বরবাদ হ'য়ে যায়। আবার ঐ অমনতর মেয়েদের যারা বিয়ে করে দাম্পত্য জীবনে অবনিবনার দরুন তাদের জীবনও জ্বালাময় হ'য়ে ওঠে। উৎসাহ উদ্দীপনা না থাকার দরুন তাদের পক্ষে জীবনে কৃতী হওয়া দুরূহ হয়। আবার যে পুরুষরা ব্যভিচার করে অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুন তাদের মস্তিষ্ক অনেকখানি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে। তাই যে কোন কাজই তারা করুক তা ত্রুটিবিচ্যুতি-দুষ্ট হয়ই কি হয়। মানসিক শান্তিও তাদের উবে যায়। পাপ এমন জিনিস যে তা অনবরত মানুষকে কুরে কুরে খায়।

কালিদাসদা—এমনতর অপরাধ কেউ যদি ক'রে থাকে তাহ'লে তার নিস্তারের পথ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিস্তারের পথ হ'ল আন্তরিক অনুতাপ সহকারে উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট খ্যাপন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করা। প্রকৃত অনুতাপের লক্ষণ হ'ল সেই পথে আর পা না বাড়ান। আবার নিজের দ্বারা যাদের ক্ষতি হয়েছে সম্ভবত সে ক্ষতির পরিপূরণে বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। এটা করতে হয় এমনভাবে যাতে অপরের অমর্য্যাদা বা অসম্মানের কারণ না ঘটে।

প্রফুল্ল—আপনার এই ধরনের একটা ছড়া আছে—

"পাপে যখন আসে ঘৃণা
আসে আক্রোশ, অপমান
ইষ্ট প্রাণন ফেঁপে ওঠে
তখনই পাপের পরিত্রাণ"

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টপ্রাণতাই হ'ল মোক্ষম জিনিস যা, সব পাপ পুড়িয়ে দেয়। আমাদের দ্বারা কারও যদি কোন ক্ষতি হয় সে ক্ষতিরও প্রতিবিধান হ'তে পারে, যদি আমরা বাস্তব প্রচেষ্টায় তার অন্তরের ক্ষত মুছে দিয়ে প্রেরণা ও প্রবোধনার ভিতর দিয়ে তাকে আকৃষ্ট ক'রে ইষ্টে যুক্ত করে তুলতে পারি। তখন সেও জীবনের রাজপথ পেয়ে যায়। অবশ্য কারও নিজস্ব আগ্রহ না থাকলে তাকে উন্নতির পথে পরিচালিত করা যায় কমই।

২৯শে চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৫৫ (১২।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। পূজনীয় খেপুদা এবং নরেনদা (মিত্র), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), যতীনদা (দাস), কালিদাসদা (মজুমদার), সুরেনদা (বিশ্বাস), শরৎদা (হালদার), হরিদাসদা (সিংহ),

হরেনদা (বসু) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতিদের উদ্দেশ্য ক'রে বললেন—আপনারা যদি বাতকে বাত যতি না হ'য়ে সত্যিকার যতি হন, তবে মানুষের অভাব হবে না। Compromising (আপসরফা প্রবণ) বা ম্যাদাটে হওয়াও ভাল না, আবার tussling (দ্বন্দ্বপ্রবণ) হওয়াও ভাল না।

খেপুদা—সত্যিই ট্যামটেমে রকম ভাল লাগে না।

শরৎদা উৎসাহভরে বললেন—এইবার ভাল ক'রে লাগা যাক খেপুদা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেগে ত আছেনই, যেমনটা বলি এইবার তেমনটা হন। নাহ'লে করা হয় না। আপনাদের দোপাতে রকমে চললে হবে না। কায়মনোবাক্যে ষোল আনা ইষ্টের জন হ'য়ে ওঠা লাগবে। ভাল হওয়ার হাউস আছে মন্দটা পুষে রেখে চলছি, এইভাবে চললে হবে না। নাছোড়বান্দা হ'য়ে সবখানি শক্তি, বুদ্ধি-বিবেচনা, শরীর-মন, বাক্য ও কর্ম্ম ভালর দিকে এমন ক'রে লাগাতে হবে যে, প্রবৃত্তি যেন বিন্দুমাত্র সুযোগ না পায় তার মধ্যে দাঁত বসাবার। সংকল্পবদ্ধ হ'য়ে চ'লে কৃতকার্য্যতায় দাঁড়ান। Nothing succeedes like success (অন্যকিছু সাফল্যের মত সফল হয় না)।

সুশীলদা (বসু)—একজন মনীষী বলেছেন—Nothing fails like success (কৃতকার্য্যতার মত অন্যকিছু তত অকৃতকার্য্য হয় না)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—selfish enjoyment (স্বার্থপর ভোগ)-এর জন্য যদি success (কৃতকার্য্যতা) হয়, success-এ (কৃতকার্য্যতায়) যদি আসক্ত ও আবদ্ধ হয় এবং তাতে যদি অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়, effort ও growth (চেষ্টা ও অগ্রগতি) যদি রুদ্ধ হয়, সেখানে ঐ কথা খাটে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ কথার সূত্র ধরে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

আত্মোপভোগের জন্য
স্বার্থক্ষুধাতুর হয়ে
যতই যে বিষয়ে
কৃতকার্য্য হও না কেন,
তৎসঞ্জাত অহঙ্কার
দক্ষমন্যতার কুয়াশায়
তোমাকে অন্ধ ক'রে দেবেই কি দেবে
নিরর্থক হ'য়ে উঠবে তার পরিণাম ;
যদি কৃতীই হ'তে চাও, তা চে'ও—

আত্মোপভোগের লিপ্সায় নয়কো,
বরং, অনাসক্ত হ'য়ে—

বীর্য্যবত্তায়—
ইষ্টার্থে ;—
জীবন অভিনন্দিত হবে—
উৎকর্ষী উপঢৌকনে;
প্রকৃত উপভোগই ঐখানে।

সুশীলদা—আপনি যা বলছেন তাতে ত দাঁড়ায় এই যে—আত্মোপভোগের কামনা নিয়ে আমরা যে কোন কৃতিত্বই লাভ করি না কেন, তা' শেষ পর্য্যন্ত অনর্থের সৃষ্টি করতে বাধ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বইকি ? সেই জন্যই ত গীতায় আছে—"যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্"। তার মানে ইষ্টে যুক্ত হ'য়ে তাঁরই স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা ও প্রীত্যর্থে যা কিছু করতে হবে জীবনে। নইলে আমরা জড়িয়ে যাব, লেজেগোবরে হ'য়ে পড়ব, অবাধভাবে অগ্রগতির পথে চলতে পারব না।

৩০শে চৈত্র, বুধবার, ১৩৫৫ (ইং ১৩।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুর পাশে পশ্চিমাস্য হ'য়ে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট।

আজ থেকে ৪৪তম ঋত্বিক অধিবেশন আরম্ভ। বহু স্থান থেকে বহু দাদা ও মায়েরা এসেছেন। তাদের অনেকের হাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য ফল, তরিতরকারী, মিষ্টি ইত্যাদি। তারা দলে দলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে আসছেন। যাদের হাতে ভোগের জিনিসপত্র আছে শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের বলছেন—

বড়বৌ-এর কাছে দিয়ে আসগে।

তারা সেইমত ভোগের দ্রব্যাদি শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করছেন। লোকজনের সমাগম দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই আনন্দিত। অনেকের কাছেই কুশল প্রশ্নাদি করছেন এবং অন্যান্য কর্ম্মীদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। এই-ভাবে কিছু সময় কাটল।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। এখন ভক্তবৃন্দ দূরে দাঁড়িয়ে পরম আগ্রহভরে তাঁকে দর্শন করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এবং যতিবৃন্দকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—এবার কর্ম্মীদের বিশেষ করণীয় হ'লো—

(১) ৩০০০ কৃষ্টিবান্ধব করা। অবশ্য এর মধ্যে কয়েকশ হয়েছে। যা বাকী আছে তা করতে হবে।

(২) বিশিষ্ট দেড় লাখ লোকের দীক্ষা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা এবং সাধারণ দীক্ষা বাড়ান। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংগঠন জোরদার করতে হবে। সংগঠন মানে প্রত্যেকটি সৎসঙ্গীকে সক্রিয় যজন, যাজন ইষ্টভৃতি ও সদাচারপরায়ণ ক'রে তোলা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিকতা গজিয়ে তোলা। প্রত্যেকে তার ব্যক্তিগত জীবন-চলনাকে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ক'রে বাস্তবে যাতে কৃতী হয় তাই করা। লক্ষ্য করবেন তারা যেন ম্যাদাটে ন্যাকা না হ'য়ে যায়। বরং হনুমানের মত ঊর্জ্জী ভক্তিসম্পন্ন ও পরাক্রমী হ'য়ে ওঠে। তারা যেমন ম্যাদাটে compromising (আপোসরফা প্রবণ) হবে না আবার tussling (দ্বন্দ্বপ্রবণ) ও হবে না।

(৩) কলোনীর ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা।

(৪) তাছাড়া আরও ছয়জন যতি সংগ্রহ করতে হবে। সন্ন্যাসী না হ'লে কাম হয় না। আপনারা ঠিক ঠিক হ'লে আপনা থেকেই লোক জুটে যাবে। হুড়-হুড় করে লোক এসে যাবে। এমন লোক চাই যারা allowance-এর (ভাতার) তোয়াক্কা করবে না। পেছটানহীন ঊর্জ্জী যতি চাই।

আপনারা যারা যতি তাদের প্রত্যেকের চালচলন এতই পবিত্র হবে যাতে তার ছোঁয়াচ লেগে বাইরে থেকে আগত প্রত্যেকে যেন একটা নূতন রং নিয়ে যেতে পারে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে। মনে রাখবেন you are the rescue of humanity (আপনারাই মনুষ্যজাতির মুক্তিদাতা)। আপনাদের ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা চলা লাগবে, পালা লাগবে—অটুট ও কঠোর উদ্যমে। আলোকের গতি যদি অন্ধকারের গতির থেকে প্রবল না হয় তবে এই বিপুল অন্ধকারকে আলোকিত করতে পারবে না।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী) একটি স্বরচিত কবিতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—বেশ ভাল হয়েছে।

পরে বললেন—বক্তৃতা-টক্তৃতা এমন অভ্যাস ক'রে ফেলতে হয়, হাত-নাড়া, চাউনি, ভঙ্গী এমনভাবে এস্তামাল করতে হয়, এমন emotional push (ভাব-মুখর উচ্চেতনা) জোগাতে হয় যে, মানুষ তা' শুনে যেন একেবারে মূৰ্চ্ছিত হ'য়ে যায়। একটা প্রচণ্ড উৎসাহ সৃষ্টি করা চাই। সবই তপের জিনিস, অভ্যাস ক'রে আয়ত্ত করতে হয়। যে জিনিস চারাতে চাও, তার ছবিটা এমন সুন্দরভাবে এঁকে দেবে যে মানুষের মন যেন কেড়ে নেয়। সবগুলি faculty (কার্য্যকরী ক্ষমতা)কে

(১) ৩০০০ কৃষ্টিবান্ধব করা। অবশ্য এর মধ্যে কয়েকশ হয়েছে। যা বাকী আছে তা করতে হবে।

(২) বিশিষ্ট দেড় লাখ লোকের দীক্ষা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা এবং সাধারণ দীক্ষা বাড়ান। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংগঠন জোরদার করতে হবে। সংগঠন মানে প্রত্যেকটি সৎসঙ্গীকে সক্রিয় যজন, যাজন ইষ্টভৃতি ও সদাচারপরায়ণ ক'রে তোলা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিকতা গজিয়ে তোলা। প্রত্যেকে তার ব্যক্তিগত জীবন-চলনাকে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ক'রে বাস্তবে যাতে কৃতী হয় তাই করা। লক্ষ্য করবেন তারা যেন ম্যাদাটে ন্যাকা না হ'য়ে যায়। বরং হনুমানের মত উর্জ্জী ভক্তিসম্পন্ন ও পরাক্রমী হ'য়ে ওঠে। তারা যেমন ম্যাদাটে compromising (আপোসরফা প্রবণ) হবে না আবার tussling (দ্বন্দ্বপ্রবণ) ও হবে না।

(৩) কলোনীর ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা।

(৪) তাছাড়া আরও ছয়জন যতি সংগ্রহ করতে হবে। সন্ন্যাসী না হ'লে কাম হয় না। আপনারা ঠিক ঠিক হ'লে আপনা থেকেই লোক জুটে যাবে। হুড়-হুড় করে লোক এসে যাবে। এমন লোক চাই যারা allowance-এর (ভাতার) তোয়াক্কা করবে না। পেছটানহীন উর্জ্জী যতি চাই।

আপনারা যারা যতি তাদের প্রত্যেকের চালচলন এতই পবিত্র হবে যাতে তার ছোঁয়াচ লেগে বাইরে থেকে আগত প্রত্যেকে যেন একটা নূতন রং নিয়ে যেতে পারে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে। মনে রাখবেন you are the rescue of humanity (আপনারাই মনুষ্যজাতির মুক্তিদাতা)। আপনাদের ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা চলা লাগবে, পালা লাগবে—অটুট ও কঠোর উদ্যমে। আলোকের গতি যদি অন্ধকারের গতির থেকে প্রবল না হয় তবে এই বিপুল অন্ধকারকে আলোকিত করতে পারবে না।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী) একটি স্বরচিত কবিতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—বেশ ভাল হয়েছে।

পরে বললেন—বক্তৃতা-টক্তৃতা এমন অভ্যাস ক'রে ফেলতে হয়, হাত-নাড়া, চাউনি, ভঙ্গী এমনভাবে এস্তামাল করতে হয়, এমন emotional push (ভাব-মুখর উচ্চেতনা) জোগাতে হয় যে, মানুষ তা' শুনে যেন একেবারে মূর্চ্ছিত হ'য়ে যায়। একটা প্রচণ্ড উৎসাহ সৃষ্টি করা চাই। সবই তপের জিনিস, অভ্যাস ক'রে আয়ত্ত করতে হয়। যে জিনিস চারাতে চাও, তার ছবিটা এমন সুন্দরভাবে এঁকে দেবে যে মানুষের মন যেন কেড়ে নেয়। সবগুলি faculty (কার্য্যকরী ক্ষমতা)কে

সে জায়গায় নিজে বুঝে খোঁজ খবর নিয়ে করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—কাল পয়লা বৈশাখ, গুরুবার, এই শুভদিনে যতিদের ভজন দিয়ে দেন। ফিঙ্গে হ'য়ে লাগুক, দেখেন কি হয়। পরমপিতার দয়ায় এরা হয়ে উঠলে আর ভাবনার কিছু নেই। এরা কজনেই পারবে সব ঠিক করতে।

যতীনদা (দাস)—আমি নিজের ভুল ধরতে চেষ্টা করি, কিন্তু সবসময় ধরতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরস্পর পরস্পরকে ধরিয়ে দিতে হয়। নিজেরটা নিজে অনেক সময় ধরা যায় না। আমার দাঁড়ানটা, কথা কওয়াটা, কাজটা আর একজনের কাছে কেমন লাগল, তা' সব সময় নিজে বোঝা যায় না। অপরে যদি তা' ধরিয়ে দেয় তাতে নিজের পক্ষে সুবিধে হয়—অবশ্য যদি আত্মসংশোধনের ইচ্ছা থাকে। ভালভাবে ধরিয়ে দিলে যদি আপনি চটে যান, তাহ'লে বুঝতে হবে আপনি নিজের ভাল চান না। একজন ধরিয়ে দিল আপনি চটলেন না, নিজের ভুল বুঝতে পারলেন অথচ তা' ঠিক করলেন না, তাতেও কিন্তু হবে না। ধরিয়ে দিলে তখন তখনই তা adjust (নিয়ন্ত্রণ) করবেন—সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-বিচার ত থাকবেই। এতখানি সজাগ থাকা লাগে যাতে পরে ঐ ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। অপরে আমাদের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিলে inferiority-তে (হীনম্মন্যতায়) খাই লাগে। তাই স্বভাবতঃই অজ্ঞাতসারে চটে যাই। হীনম্মন্যতায় ঘাই লাগাটা যে একটা দোষ তা' নিজে থেকে বোঝা লাগে। বুঝে consciously (সচেতন-ভাবে) চেষ্টা ক'রে ঐ দোষ overcome (অতিক্রম) করা লাগে। পরে নিজের ভুল ধরা ও সংশোধন করা লহমার মধ্যে ঘটে যায়—automatically ও spontaneously (সহজে ও স্বতঃই)। এমন হওয়া চাই যে, আপনার ভিতর যে কোন চাঞ্চল্য আসতে যাচ্ছে তা' বাইরের কেউ যেন ধরতে না পারে। সেকেণ্ডের দশ ভাগের মধ্যে সব ঠিক ক'রে ফেলা লাগে। শ্বাস-প্রশ্বাস আগে voluntary (ঐচ্ছিক) ছিল। এখন যেমন involuntary (স্বতঃ) হ'য়ে গেছে—ঐ রকম ক'রে ফেলা লাগে। নামটাম হরদম করতে হয়। আর সব কাজের মধ্যে দিয়ে চোখ, নাক, কান ইত্যাদি সব ইন্দ্রিয়ের exercise (অনুশীলন) করতে হয়। আর কোনও ধারণায় obsessed (অভিভূত) হ'য়ে থাকতে নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্তোষ প্রকাশ ক'রে বললেন—কয়েকটা লোক ঠিক মত চলতে শুরু করলে পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও তার প্রভাব গিয়ে পড়ে। যতি-আশ্রম হওয়ার পর এর প্রভাবে কত মেয়েছেলেরা পর্য্যন্ত শেষ রাত্রে উঠে নাম করা শুরু করেছে।

বাইরের গৃহস্থরাও আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে যতির মত চলছে। বিড়ি তামাক ছেড়ে দিয়েছে, দোকানে খায় না, নামধ্যান আত্মবিশ্লেষণ খুব করে। এইসব দেখে আমার খুব আনন্দ হয়। যা হোক, সাধন ভজনের সময় মেয়েলোকের কাছ থেকে কিছুটা দূরে থাকতে হয়। নিজেদের দুর্ব্বলতা থাকে, তাই মেয়েদের নিকট সান্নিধ্যে গেলে মনে স্বভাবতঃই দুর্ব্বলতা আসে। যখন উপরে উঠতে হবে তখন এমন কিছু করা ভাল নয় যাতে মন নিম্নগামী হয়।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুষমামার রকমটাই আলাদা, কতকটা যেন স্বভাব সন্ন্যাসিনী।

বেলা এগারটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

কসরত করে চরিত্রকে
সাজান যতকাল থাকে,
ততদিন বোঝা যাবে
যে তা' সত্তায় গাঁথেনি
তাই অভ্যাস এমন ক'রে করতে হয়
যাতে তা' কসরতের পারে গিয়ে
স্বতঃ হয়ে ওঠে।

এর কিছু সময় পর বড়াল বাংলোর ভিতর জলভরা চৌবাচ্চায় নেবে স্নান করার সময় উপরোক্ত বাণীর সূত্র ধরে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—ভাল মন্দ সব অভ্যাসই ঐ রকম পেয়ে বসে। চুরি অভ্যাসও ঐ রকম হয়, আপনিই করে, না ক'রে পারে না। চোরদের চুরি অভ্যাস ছাড়াতে গিয়ে আমি এটা ভাল ক'রে বুঝেছি। অন্যান্য বদ অভ্যাসের বেলায়ও অমনতর হয়। ভাল অভ্যাস সত্তায় গেঁথে গেলে তা' কিন্তু সহজে নষ্ট হয় না। যা সত্তায় গেঁথে ওঠে তার আবার সন্তান-সন্ততিতে বর্ত্তাবার সম্ভাবনা থাকে। এটা অবশ্য আমার কথা।

কালিদা (সেন)—সত্তা বলতে ত তার একটা metaphysical-sense (দার্শনিক অর্থ) আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Metaphysics (অধিবিদ্যা)-টাই physics (পদার্থবিদ্যা), যেমন energy (শক্তির)-র সঙ্গে আছে matter (বস্তু)।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিনোদদা (মুন্সী)-কে দেখে মধুর হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি খবর ?

বিনোদদা—আপনার দয়ায় খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে বসে নিম্নলিখিত স্মরণীয় বাণীটি দিলেন—

শোন যতি! শোন সন্ন্যাসী!
এই ব্রতে ব্রতী হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে
দৃঢ়নিশ্চয় ক'রে বেঁধে রেখো
অন্তরে তোমার—
তুমি তাঁরই সন্তান—যিনি অনামী পুরুষ
তোমারও নাম নাই—
ছিলও না কখনও—
যে-নামেই অভিহিত হও না কেন—
তা' তোমার উপাধির—
বিবর্ত্তনের বহু ঘূর্ণি অতিক্রম ক'রে
সংযোগ-বিয়োগের প্রস্রবণে
ভেসে-ভেসে তুমি আজ যে বা যা-তে
পরিণত হয়েছ—সেই পরিণামের,
আর, যে-শরীরে তুমি আজ অধিষ্ঠিত—
তাই তোমার অতিথি-আবাস;
তোমার কেউ নাই—
কেউ ছিল না—
দেখছ যা আছে—
তাও কিন্তু নাই বলেই জেনে রেখো,
বিশ্বেশ্বর যিনি—তাঁর আশীর্ব্বাদই তুমি,
আর তিনিই তোমার একান্ত
তাঁর মূর্ত প্রতীক তিনিই—তোমার ইষ্ট;
তোমার গৃহের ছাদ আকাশ,
শয্যা তোমার —
এই শ্যামলীমায়ের বুকে
বিছিয়ে রয়েছে যে তৃণবিতান,
প্রকৃতির দুর্যোগ বা স্বস্তি—
তাঁরই শাসন ও প্রেমচুম্বন,
মনে রেখো, ক্ষুধায় অন্ন পাবে না—
তৃষ্ণায় জল পাবে না—

পরিধানে বস্ত্র পাবে না
অর্থ পাবে না—
রোগে শুশ্রুষা পাবে না—
ঔষধ পাবে না,
আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন
যারা তোমার উপর নির্ভর ক'রে জীবন ধারণ করে—
তারা হয়তো তোমার সম্মুখে
দুর্দ্দশার পরিপেষণে
নিষ্পেষিত হ'য়ে যাবে,
হয়তো প্রত্যেকে তোমাকে ঘৃণা করবে—
অপমান করবে—
বিচারে উপস্থাপিত করবে,—
তবুও তোমাকে অটল থাকতে হবে—
অচল থাকতে হবে—
অটুট এক নিষ্ঠায়
প্রবৃত্তিকে নির্ম্মম অবজ্ঞায়
প্রত্যাশারহিত করে
অচ্যুত একনিষ্ঠ অধ্যাত্মানুরাগের সহিত
তাঁতেই নিরন্তর হ'য়ে
থাকতে হবে— চলতে হবে—করতে হবে—
কইতে হবে,
কাম-কাঞ্চন বা যশোলিপ্সা
যেন তোমাকে স্পর্শও করতে না পারে,
প্রত্যেক জীবনই তাঁরই বিবর্ত্তিত বিগ্রহ বলে
ইষ্টানুগ সেবায়—
প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ করে
প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাঁকেই—
অনুরতির অকাট্য সিংহাসনে
প্রত্যেকেরই অন্তরে,
তোমার তপঃপ্রাণতার জলুসে
দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে সবাইকে—

আলোকে অঢেল করে—
আর উপভোগও তোমার ওই-ই,
যা' পাও—প্রীতি-উন্মাদনার উৎসৃজনী যা'
তাতেই খুশি থেকো—সন্তুষ্ট থেকো,
বুঝে রেখো, জীবিকাও তাই তোমার,
যে বা যারা
অধিগমনের উদাত্ত উদ্যমে
সব অবস্থায় তুষ্টিকে বজায় রাখতে পারে
আশীর্ব্বাদও আসে তাদেরই কাছে
হাত বাড়িয়ে ;
আরও শোন ! আরও বলি—
তোমার সম্বিৎ—তোমার সম্বোধি—
তোমার তপোবিভূতি—
যা স্বতঃ-অনুরাগে
ইষ্টানুগ অনুরাগ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে
তোমার নিজেকে আহুতি পেয়ে
ইষ্টে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
ভূমায়িত ব্যাপ্তি নিয়ে
অণুকণাতেও আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে
একতানতায় বিরাটে পর্য্যবসিত হ'য়ে—
সার্থক ক'রে তুলেছে—
সব যা'-কিছুকে—
চেতন উদ্দীপনে
মহাচেতন সমুত্থানে
ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রত্যেককে নন্দিত ক'রে
অমরণ—পরিবেষণে,
যে-অনুভূতি তোমার
গুরুগম্ভীর ঔজ্জ্বল্যে
চিন্তা, চরিত্র, বাক্‌ ও ব্যবহারে
উৎফুল্ল-মন্থনে ঘোষণা করছে—
'মা ম্রিয়স্ব ! মা জহি !

মৃত্যুমবলোপয়'—
তাকে প্রতি ব্যষ্টি-জীবনে
প্রতি সমাজ-জীবনে
প্রতি রাষ্ট্র-জীবনে
জীবন্ত পরিবেষণে
সম্বর্দ্ধনী অমৃত-বিকিরণে
উজ্জ্বল করতে
নিরন্ত থেকো না কখনও,
তোমার আচার, তোমার নিয়ম,
তোমার নিষ্ঠা, তোমার চিন্তা,
তোমার বাক্, তোমার কর্ম্ম'—
এক-কথায়, তোমার জীবন
দুন্দুভি-নিনাদে
অমৃত-বিকম্পনে
আহ্লাদ-ঔজ্জ্বল্যে
যেন সবাইকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—
জীবন্ত ক'রে তোলে
ঐক্যে-শক্তিতে-স্থৈর্য্যে—
পারস্পরিক সহযোগিতায়—
সম্বর্দ্ধনী হোম-তাৎপর্য্যে।

১লা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৬ (ইং ১৪।৪।৪৯)

এবার ঋত্বিক অধিবেশনে খুব লোক সমাগম হয়েছে। আজ নববর্ষের প্রথম দিন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে প্রসন্নবদনে গোলতাঁবুর পাশে ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। আকুল আগ্রহে দলে দলে লোক এসে সমবেত হলেন বড়ালবাংলোর প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমক্ষে। প্রণামান্তে দাদা ও মায়েরা ঋত্বিগাচার্য্যের পরিচালনায় সমবেতভাবে বিনতি-প্রার্থনাদি শুরু করলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, ভক্তিপ্রাণ সহস্র সহস্র নর-নারীর দৃষ্টি তাদের জীবনেশ্বরের শ্রীমুখপানে নিবদ্ধ। বিনতি প্রার্থনাদির পর সবাই একে একে প্রণামীসহ প্রণাম করলেন। আশ্রমের অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের

জন্য মালা গেঁথে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁকে পরিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেককে আবার ঐ মালা আশীর্ব্বাদ স্বরূপ প্রত্যর্পণ করলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে আসলেন। যতিবৃন্দ অর্থাৎ শরৎদা (হালদার), নরেনদা (মিত্র), কালিদাসদা (মজুমদার), যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুরেনদা (বিশ্বাস) আজ ভজন-দীক্ষা পেলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতিদের কাছে ভজন সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন —এর দুটো factor (দিক)—একটা শব্দানুসরণ আর একটি শব্দানুসন্ধান। নিবিষ্ট হ'য়ে নিভৃতে এটা করতে হয়। অনুসন্ধান করছি কিছুই আসছে না, আবার হঠাৎ দূরে, অতিদূরে যেন একটা আওয়াজ হচ্ছে অথচ কি আওয়াজ ঠিক টের পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর একাগ্রতার ফলে সেই আওয়াজ যেন কাছে এগিয়ে আসছে। তখন হয়ত ধরা পড়ছে চকচক, চকাচক শব্দ হচ্ছে। সে বড় মনোরম। ভারি ভাল লাগে। সমগ্র সত্তা যেন সেই শব্দ শ্রবণে উদগ্র আগ্রহে উন্মুখ হ'য়ে থাকে। ক্রমে সেই শব্দের রেশ ও ধুন সমস্ত nervous system (স্নায়ু বিধান)-কে আন্দোলিত ক'রে তোলে। এই করতে করতে যেন একটা নেশা চেপে যায়। কত রকম শব্দ ও জ্যোতি যে আসে তার কি শেষ আছে ? ও যেন সত্তার চির-কালীন নিজস্ব জিনিস। তাই নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ মেলে এতে।... এক সময় দারুণ ঢং ঢং শব্দ হয়। সে শব্দ যেন একেবারে সত্তাকে গুঁড়িয়ে দেবার উপক্রম করে। তাকে বলে death bell (বিলয় ঘণ্টা)। তীব্র ইষ্টানুরাগ না থাকলে ঐ অবস্থায় আত্মসম্বিৎ বজায় রাখা শক্ত হয়। নানা স্তরে কখনও শঙ্খধ্বনি, কখনও ঝাঁঝ বাজানর শব্দ, কখনও মৃদঙ্গ ধ্বনি, কখনও ঘণ্টা বাজানর শব্দ শোনা যায়। পূজা-পালিতে যে সব বাদ্য বাজান হয় আমার মনে হয় সেগুলি বোধহয় এইসব শব্দেরই অনুকরণস্বরূপ বাহ্যভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। ভিতর থেকে যখন আসে তখন যে কি মিষ্টি লাগে ! মৃদঙ্গের শব্দ যা হয় অতি চমৎকার, তার তুলনা হয় না। শব্দ শোনার নেশা চেপে বসে। সাধন জগতে প্রত্যক্ষ অনুভূতিগুলি যখন আসে তখন একটা নিবিড় প্রত্যয় জাগে। বাইরের লোক এসব সম্বন্ধে যতই সংশয় প্রকাশ করুক না কেন, তাতে মানুষকে আদৌ টলাতে পারে না। কারণ এগুলি ত মানুষ নিজ সত্তা দিয়ে জলজ্যান্তভাবে অনুভব করে। তাই একটা অকাট্য প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়।

আমি ভজন সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখেছিলাম ভজন পাওয়ার আগে, সে পৈতে হওয়ার পরে।

করতে হয়, এই রাজ্যে করে যে পাওয়াটা হয় সে পাওয়াটা হওয়ার সামিল।

তার কারণ সুরত ও চেতনা ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর স্তরে আরূঢ় হয়। তখন করা, বলা, ভাবা ঐ ধাঁজে, ঐ ঝোঁকে চলতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচেষ্টা থাকে যাতে ঐ স্তর থেকে মনটা নেমে না যায়। প্রধান জিনিস হ'ল ইষ্টের মনোজ্ঞ চলনে চলে তাঁকে খুশী ক'রে তাঁর খুশীতে খুশী হওয়া। এই প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন চালাতে চালাতে ভিতর ও বাইরে থেকে মানুষটা যেন বদলে যায়। ইষ্টই যেন ভর করেন তাকে এবং চালিয়ে নিয়ে চলেন, তাই অহং এখানে স্বতঃই নিরস্ত হয়। মানুষ দেখে যে তার কেরদানি কিছুই নেই। যা হচ্ছে তা' যেন তাঁর দয়াতেই হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিবৃন্দও আছেন। আমরা ভুলে যাই কেন এবং তার প্রতিকার কি, সেই সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—মানুষ অনেক unpleasant (অপ্রীতিকর) প্রসঙ্গ ভুলতে চেষ্টা করে সেটা একটা কারণ, যার দরুণ স্মরণযোগ্য জিনিসও মানুষ ক্রমে ক্রমে ভুলতে থাকে। তাছাড়া দু'টো চিন্তা একই সঙ্গে আসলে হয় দু'টোই যায়, না হয় একটা যায় একটা থাকে। এরকম ঘটে association (অনুসঙ্গ)-এর channel (প্রবাহ)-টা ভেঙ্গে যায় বলে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—মনে রাখার জন্য সব note (লিপিবদ্ধ) করা লাগে, তাতে আস্তে আস্তে memory (স্মৃতি)-টাও cultured (অনুশীলিত) হয়। আর ভজন করা লাগে, ওতে nerve (স্নায়ু) চাঙ্গা থাকে। তাছাড়া ওর ওষুধ যে কিছু আছে, তা' মনে হয় না।···পেট continually (ক্রমাগত) খারাপ থাকতে থাকতে memory (স্মৃতি) আবার dull (দুর্ব্বল) হয়। তাই পেট ভাল রাখা লাগে।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর গোল তাঁবুতে এসে বসলেন। অদূরে বড়াল বাংলোর প্রাঙ্গণে চৌকি পেতে একটি সাময়িক মঞ্চ তৈরী হয়েছে। সুধাদির পরিচালনায় সেখানে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি ও সঙ্গীতাদি শুরু হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেগুলি মনোযোগ সহকারে শুনলেন এবং বেশ উপভোগ করলেন। প্রায় প্রত্যেকটি বালক বালিকা নিঃসংকোচে তাদের আবৃত্তি ইত্যাদি করায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীত হ'য়ে বললেন—নির্ভয়ে সহজভাবে করছে—এটা খুব ভাল। বিভিন্ন রকমের অনুশীলন যত করান যায়, ততই ভাল। যার যেদিকে প্রতিভা আছে সেই প্রতিভা যাতে আরও বিকশিত হয়, তার ব্যবস্থা করা লাগে। মণি যে সবাইকে নিয়ে থিয়েটার করে, এতে একদল বেশ তৈরি হয়েছে। তারা (বাগচী) থাকতে তারও এদিকে খুব ঝোঁক ছিল।

এই অনুষ্ঠানের পর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। ভজনের

রকমারি অনুভূতি প্রসঙ্গে বললেন—ভজন করতে করতে এমন অবস্থা হয় মনে হয় প্রাণ নেই, একেবারে মরে গেছি। তখনও কিন্তু চেতনা থাকে ও সাধনের প্রয়াস চলতে থাকে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় না যে ভিতরে ভিতরে তপস্যার ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। তাই বলছিলাম দারুণ ইষ্টনেশা না থাকলে ঐসব সময় লয় এসে যেতে পারে। তাতে সাধনার অগ্রগতি যেমন রুদ্ধ হয়, আবার সাধক কাঁচা অবস্থায় মনে করে যে তার চরম ও পরম সিদ্ধি হয়ে গেছে। আদত কথা তখনও বহু knot (গ্রন্থি) unsolved (অসমাহিত) থাকে। আর সেইটেকে চূড়ান্ত বলে মনে করে যদি নানা ব্যাপারের সমাধান দিতে যায়, তার মধ্যে অনেক গোল থাকে। এইভাবে অজান সাধক নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়, আবার অন্যকেও বিভ্রান্ত করে। অনেক সাধকের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি দেখা দেয়। লোকে তা' দেখে মনে করে যে ইনি একজন মহাপুরুষ। কিন্তু ভগবৎ পথে ঐসব সিদ্ধাইয়ের দাম কিছুই নয়কো, তা বরং মানুষকে লক্ষ্যচ্যুত ক'রে দেয়।

ভজনের সময় কখনও কখনও ছিটকে ফেলে দেয়। এখানে বসে আছি, ক' হাত দূরে হয়ত ছুঁড়ে ফেলে দিল।

হঠাৎ হয়ত ভীষণ আগুন দেখলাম। সবাই যে একরকম দেখে তা' নয়। প্রত্যেকের অতীত সংস্কার অনুযায়ী কত রকমারি অনুভূতি যে হয়, তার লেখা-জোখা নেই।

গেস্ট হাউসে কীর্ত্তন হচ্ছে। গান ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মধ্য দিয়ে খোলের আওয়াজ টের পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—খোলের শব্দটা যেমন অনুসন্ধান ক'রে বোধ করতে পাচ্ছেন, সেইরকম, শব্দ অনুসরণ করতে হয়। বিভিন্ন শব্দের মধ্যে পার্থক্য করতে হয়। কোনটা কোন শব্দ তা' নির্দ্দিষ্টভাবে ধরতে হয়। তার কারণ অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের শব্দ মিশ্রিত ভাবে আসে। তার মধ্যে কোনটা কি প্রত্যেকটা আলাদা ক'রে ধরতে হয়। যেমন বাইরের জগতের কথাই মনে করেন—ধরেন একটা concert (একতান বাদ্য) বাজছে তার মধ্যে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ একাকার হ'য়ে মিলে যায়। যাদের শ্রবণ শক্তি ও মনোযোগ প্রখর তারা ওর ভিতর দিয়েই ধরতে পারে কোন কোন যন্ত্রের শব্দ হচ্ছে এবং তার মধ্যে কোনটা কি। সবই অনুশীলন সাপেক্ষ ব্যাপার।

কখনও পাখোয়াজের শব্দ পাওয়া যায়। কত রকমের যে হয় তার ইয়ত্তা নাই। এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে যা বলেছি, তাতে কিন্তু সামান্যই বলা হয়েছে। যা বলা হয়নি, তার পরিমাণ কিন্তু অজস্র। আপনারা করতে লাগলে, আপনাদের

হ'তে থাকলে, তখন বুঝতে পারবেন যে এ ব্যাপার ব'লে শেষ করা যায় না।

কখনও বোধ হয় universe (ব্রহ্মাণ্ড)-টাই যেন দোল খাচ্ছে। এক চন্দ্র থেকে কত চন্দ্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। মানুষের যত রকমের বোধ আছে—যেমন ঝুলন খেলা, দোল খেলা, তাল খেলা, ইত্যাদি সবই যেন ভিতরের বোধের expression (অভিব্যক্তি)। পূজা ও আরতির সময় যে সব বাজনা বাজে সেগুলি যেন ওরই রকমফের। ঐ যে গান আছে—"তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন তারা" তা কিন্তু শুধু কল্পনা নয়। বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে নিজস্বভাবে এক মহা তপস্যা চলেছে। মানুষ যখন জীবনের তাৎপর্য্য বোঝে তখন দেখে অতন্দ্র তপস্যার ভিতর দিয়ে জীবন সত্যকে উপলব্ধি করাই মানুষের আসল কাজ। যারা হেলায় ফেলায় জীবনটা নষ্ট করে, তাদের হতভাগা ছাড়া আর কি বলা চলে?

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত জগজ্জ্যোতিদা (সেন)-কে ডাকা হল। তিনি আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বললেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—স্বামীজীর লেখা থেকে সেই জায়গাটা জগ-জ্যোতিকে প'ড়ে শোনা ত।

"ভারতে বিবেকানন্দ" বইটি এনে স্বামীজীর "স্বদেশহিতৈষিতা" বিষয়ক লেখা থেকে জগজ্জ্যোতিদাকে প'ড়ে শোনান হল।

স্বামীজী সেখানে কৃতকর্ম্মতা, হৃদয়বত্তা ও প্রাণপণ অধ্যাবসায় এই তিনটি জিনিসের কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছেন। পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই তিনটে আবার coordinated (সমন্বিত) হওয়া চাই। আর সেটা হ'তে পারে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। ঐটুকু থাকলে জিনিসটা complete (সম্পূর্ণ) হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর জাগরণী নাম দিয়ে নিম্নলিখিত বাণীটি দিয়েছেন—

ওঠো, জাগো—
বরণীয় যিনি তাঁতে
নিবুদ্ধ হও—
ঊষা এল আজ
এ-জীবনে নবীন হ'য়ে
নবীন উদ্যমে—অর্ক-আলোকে,
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল
তাঁরই জীবনমন্ত্রে—
ওঠ, আসন গ্রহণ কর,

প্রার্থনা কর,
প্রবুদ্ধ হ'য়ে সকল কর্ম্মে
তাঁকে পরিপালন কর,
শান্তি আসুক,
স্বধা আসুক,
স্বস্তি আসুক—
তোমার জীবনে জীবন্ত হ'য়ে।

এটি দেওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় জামাইবাবু—শ্রীঅপূর্ব্ব সুন্দর মৈত্রের উপর এর একটা সুর দেওয়ার ভার দিয়েছেন। অপূর্ব্বদাও এই গদ্য কবিতার উপর সুর সংযোজন ক'রে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও উক্ত সুর অনুমোদন করেছেন।

২রা বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৫৬ (ইং ১৫।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—খুব সকালে উঠে ভোর চারটের মধ্যে প্রাতঃকৃত্যাদি ও নামধ্যান সেরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জাগরণী গান গেয়ে সবাইকে জাগিয়ে দিতে হয়। তাড়াতাড়ি যাতে নামধ্যানে বসে তা' করতে হয়। ওতে লোকে আনন্দ পায়, স্ফূর্তি পায়, তাদের শরীরও ভাল থাকে। আগে যতদিন ভোরে সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে নামধ্যান করিয়েছি, ততদিন মানুষ অকালে মরেনি। তাই প্রত্যেককে এটা করান লাগে।

এরপর কথা উঠল—সকাল সন্ধ্যা অন্ততঃ এই দুইবেলা ত নামধ্যানে বসা দরকার। সন্ধ্যাবেলায় সবাইকে নামধ্যানে বসাবার জন্য যাতে জাগরণীর মত একটি বাণী দেন সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরমপিতা যদি দেন তাহ'লে হ'তে পারে। নিজে থেকে আমি কিছু পারি না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

বেলা দশটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—প্রফুল্ল লিখবি নাকি? পরক্ষণেই বলতে লাগলেন—

সূর্য্য পাটে বসেছে—
সন্ধ্যা তা'র তামসী বিতানে
ঘাটে-বাটে ছড়িয়ে পড়েছে—
স্নিগ্ধ ক'রে—

বিশ্রামে ভুবনকে আলিঙ্গন করে,
তাপস ! শান্ত হও !
বরেণ্য যিনি—
তোমার সব মন দিয়ে
তাঁ'তে ছড়িয়ে পড়,
উপাসনা কর তাঁর—
দিনের সব কর্ম্মের সাথে
যা'-কিছু করেছ—স্মরণে এনে
নিবেদন কর তাঁকে—সার্থকে,
বিশ্রামের সুষুপ্তি—অঙ্কে
এলিয়ে দিয়ে—
তোমার সসত্ত্ব শরীর,
উন্মাদনার সৎমন্ত্রী সোমরস পান ক'রে
সুপ্তি পাও—তৃপ্তি পাও—
সুস্থি পাও—
উদাত্ত জীবনে আবার জেগে উঠতে।

বেলা দশটা পাঁচ মিনিটে বাণীটি দেওয়া শেষ হ'ল। তখন বাণীটি পড়া হ'ল। শুনে উপস্থিত সবাই একবাক্যে বললেন—অপূর্ব্ব হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এগুলি পরমপিতার দান। আমি ইচ্ছা ক'রে আনতে পারি না। দেখেন না! আগে কত ভাবলাম কিন্তু কিছু আসল না। পরে পরমপিতা দিলেন তাই হ'ল। আমার কাছেও জিনিসটা খুব ভাল লাগছে—জীবন চোঁয়ান ধনের মত। তবে আমার কোন আধিপত্য নাই। তিনি দয়া ক'রে যা দেন তাই দিতে পারি। আমি যেখানে, ঠিক সেখানেই আছি।

এখন যে লেখাটা দিলেন তার নামকরণ হ'ল "সায়ন্তনী"। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—একটা কপি ক'রে মণ্টু (অপূর্ব্ব সুন্দর মৈত্র)-র হাতে দিয়ে বলিস যে এটারও সুর দিতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল বাংলোর পশ্চিমদিককার মাঠে (রোহিনী রোডের পাশে) এসে বসলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), কাশীদা (রায়চৌধুরী), প্রফুল্ল প্রভৃতি সঙ্গে আছেন। পূজনীয় বড়দা আসলেন।

ঋত্বিক অধিবেশনের সময় বলে লোকের ভিড় লেগেই আছে। দাদারা ও মায়েরা দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে দর্শন করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সময়টা একটু

নিরিবিলি থাকতে চান বলে তারা কাছে আসছেন না, তবে দূর থেকে সাগ্রহে অপলক দৃষ্টিতে তাঁরই পানে চেয়ে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত জাগরণী ও সায়ন্তনী আবার পড়া হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা-প্রসঙ্গে বললেন—আগে আশ্রমে লোকজন অকালে মরত কম। তখন আমি ও মা ভোর চারটের সময় গিয়ে বাড়ি বাড়ি সকলকে জাগিয়ে দিতাম, নামটাম করতে বসিয়ে দিতাম। তখন যেন আশ্রম জমজম্ করত। আমি কেষ্টদা ও যতিদের তাই করতে বলছি। তার জন্যেই এই গান। গদ্য হ'লেও এর একটা ছন্দ আছে, দোলা আছে। মণ্টু সুরও দিয়েছে খুব ভাল। আরও আগে যদি এটা আরম্ভ করা হ'ত লোকগুলি ভাল করে দেখে যেত। তারা ক'দিন্ একটু অভ্যস্ত হোত। নিজেরা যার যার জায়গায় গিয়ে আবার এমনি করতে পারত সৎসঙ্গীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে। খুব ভাল হ'ত, ছিটিয়ে যেত সর্ব্বত্র। এখন শুরু করতে করতে ত এদের যাওয়ার সময় হয়ে যাবে।

একটু থেমে বললেন—সন্ন্যাসী যোগাড় করতে হয়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। শ্রীশ্রীঠাকুর নীরবে বসে আছেন। দূর দিগন্তের পানে উদাসভাবে চেয়ে আছেন। তামাক সেজে গড়গড়ার নলটা তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছে। আনমনাভাবে এক আধটা টান দিচ্ছেন। কিন্তু দৃষ্টি যেন তাঁর দূরে অতিদূরে—ভাব জগতের গভীরে—নিঃসীম শূন্যে বিলীন।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল বাংলোর প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। তিনি মাঝে মাঝে কখনও হীরালালদা (চক্রবর্তী), কখনও টাটা-নগরের নগেনদা (সেন), কখনও মনোরঞ্জনদা (চ্যাটার্জ্জি), কখনও জিতেনদা (মিত্র), কখনও সুবোধদা (সেন) প্রভৃতিকে ডাকিয়ে বিশেষ বিশেষ নির্দ্দেশ দিচ্ছেন এবং যাওয়ার আগে আবার দেখা করতে বলছেন।

নবাগত এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—স্বরূপ বলতে কি বুঝব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বরূপ মানে স্ব-এর রূপ। যা যা দিয়ে আমি, তার কোনটাকে বাদ দিলে স্ব-কে ধরা যাবে না। আমি শুধু শরীর বা মন নই। আবার শরীর বা মন বাদ দিয়েও নই। আত্মার ধর্ম্ম হ'ল নিরন্তর গতিশীলতা। এই গতিসম্বেগ আবার প্রকাশ পায় শরীর, মন, বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় ও বহিরেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে। তা' আবার সক্রিয় অভিব্যক্তি লাভ করে পরিবেশের ভিতর স্ব স্ব জৈবী সংস্থিতি অনুস্যূত সংস্কার অনুযায়ী। তাই চাই সমগ্র সত্তার সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান in perfect concrete concordance and coordination (নিখুঁত বাস্তব সঙ্গতি ও সমন্বয় সহ) আর সেইটেই consummation (চরম)।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

শরৎদা—আমরা কি মানুষের প্রণাম নিতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, বিশেষ ক'রে পাদস্পর্শ করে প্রমাণ করতে দেওয়া আদৌ উচিত নয়।

শরৎদা—ভূমিষ্ঠ হ'য়ে যদি প্রণাম করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোটের ওপর না নেওয়াই ভাল।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে মা, আমি, মহারাজ প্রভৃতি খুব নামধ্যান করতাম। তখন আশ্রমের বেশির ভাগ লোকই খুব নামধ্যান চালাত। প্রবাদ ছিল—আশ্রমে লোক মরে না। খাওয়া তো ছিল ঐ, অথচ activity (কাজকর্ম) ছিল কী প্রচণ্ড। অনেকেরই শরীর ছিল ঝাণ্টুরাম।

মণ্টুদা জাগরণীর সুর দিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বারবার সেই গান গাইতে বলছেন। সবাই সাগ্রহে সেই গান শুনছেন। গান শোনার জন্য যতি-আশ্রমের আশেপাশে বেশ ভীড় জমে গেছে। একটা অপূর্ব্ব আনন্দের আবেষ্টনী সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মণ্টুদাকে বললেন—কয়েকজনকে গাইয়ে গাইয়ে সুরটা এস্তামাল করিয়ে দাও, যাতে আজ শেষ রাত্রে তারা ওটা আশ্রমের বাড়ি বাড়ি যেয়ে গাইতে পারে। এখনও বাইরের লোকজন ঢের আছে। এখনই গানটা এখানে চালু হ'লে কর্মীরা বাইরে গিয়েও এটা চারিয়ে দিতে পারবে।

৩রা বৈশাখ, শনিবার, ১৩৫৬ (ইং ১৬।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বারান্দায় শুভ্র শয্যায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসেছেন। আজ ভোরে যতিরা উঠে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জাগরণী গান গেয়ে সকলকে উঠিয়ে নামধ্যানে লাগিয়ে দিয়েছেন। বেশ একটা সাড়া পড়ে গেছে, স্থানীয় ও বহিরাগত সৎসঙ্গীদের মধ্যে। শ্রীশ্রীঠাকুর এই উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে পরম প্রীত অন্তরে হাসি-হাসি মুখে যতিদের প্রত্যেককে স্নেহল দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছেন। ভক্ত ভগবানের এই মিলন-আসর সত্যিই বড় মধুর ও উপভোগ্য। সামনে গাছে বসে দুই একটি পাখি মনের আনন্দে গান গাইছে। মনে হচ্ছে তারাও যেন এই দিব্য আনন্দের ভাগীদার।

শরৎদা বললেন—কাল নামধ্যান যতটা করার তা' করতে পারিনি কাজের চাপে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসুবিধার মধ্যে দিয়েই ঠিকমত করার অভ্যাস ক'রে নিতে হবে।

প্রফুল্ল—মহাত্মাজীর জীবন খুব সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। এত কাজ করতেন কিন্তু ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে চলতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-জীবন আর এ-জীবনে আকাশ-পাতাল তফাত। তাঁরা অল্প কয়েকজন ব্যক্তির মাধ্যমে জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। বাস্তবে খুব বেশি সংখ্যক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের ব্যাপক ও গভীর সম্পর্ক ছিল না, প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে ধরে ধরে তার সব দিক নিয়ন্ত্রণ করা, পরিচালনা করা ও সংযমন করা লাগত না। দাশদা বলেছিলেন—আপনি একটা অসম্ভব কাণ্ড করছেন, প্রত্যেকটা ব্যক্তির সবটুকু নিয়ে আপনার কারবার। আমরা করি mass movement (গণ-আন্দোলন) —কয়েকেটা লোকের মধ্য দিয়ে। তার তুলনায় এ কাজ অতি কঠিন ? প্রভাতদা (দে) নিজের কিছু কিছু অসুবিধার কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই ভগবানের মানুষ—বিদ্যে-বুদ্ধি, চলন-চরিত্র, কায়দা-করণ, কাজ-কর্ম্ম, নিয়ন্ত্রণ-পরিচালন সব কিছু যদি তোর তাঁর মনোমত হয়ে না উঠল তাহ'লে কী হ'ল ?

এই কথা শুনেই প্রভাতদার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন—মাঝে মাঝে মনটা দমে যায়, কিন্তু যখনই মনে পড়ে আপনার দয়া আমাকে সর্বদা রক্ষা করছে, তখনই মনে খুব জোর পাই। আবার আপনার কাজে লেগে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার কাজ নিয়ে মাতোয়ারা হ'য়ে থাকলে প্রবৃত্তি আমাদের কাবু করতে পারে না। তাতে সব দিকই বজায় থাকে, কিন্তু প্রবৃত্তির টানে যখনই আমরা তাঁর কাজে ঢিল দিই, তখনই সমস্যার পর সমস্যা দেখা দিতে থাকে।

আসানসোলের জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক নিজের সম্বন্ধে বললেন—আমি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নানা রকম অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছি। ভাইদের অকৃতজ্ঞতা দেখে আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রীতি প্রত্যাশা ব্যাহত হ'লে মানুষের খুবই লাগে। ভাই—তাকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছ, আজ সে যদি অকৃতজ্ঞ হয় তাহ'লে বড়ই লাগে। কিন্তু মনে রেখো যিনি আমার চির আপন, যঁার দয়াতে সবকিছু পাই, দুনিয়ার বুকে টিকে থাকি, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হই বলে জীবনে এত কষ্ট পাই। তাঁকে নিয়ে আমাদের বুকখানা যদি ভরা থাকে, তাহ'লে দুনিয়ার কোন আঘাতই আমাদের টলাতে পারে না। কিন্তু তিনি ছাড়া পথও নাই, তাঁকে অঁাকড়ে ধরব যত ততই পথ পাব, শান্তি পাব।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগভরে বললেন—মানুষ যখন জন্মে তখন তার ঝোঁক থাকে তার মতন চেতন, জীবন্ত concrete (বাস্তব) কাউকে ভালবাসতে। মানুষ absolute (অখণ্ড) নিয়ে খুশি থাকে না, তাতে তার প্রাণের ক্ষুধা মেটে না। অবশ্য সেই absolute (অখণ্ড) যদি আমাদের মতন concrete (বাস্তব) হ'য়ে ধরা দেন, তখন তো তার চরম চাওয়াটার পাওয়ার পথ খুলে যায়। মানুষের ছাড়তে হয় না কিছুই। তাঁকে দিতে হয় নিজেদেরকে। তিনি যেমন নিঃশর্তে নিজেকে দিয়ে ফেলে সৃষ্টি করেছেন আমাদের, আমাদেরও তেমনি নিঃশর্তে নিজেদেরকে দিয়ে ফেলতে হয় তাঁকে। কত নাম করি, ভাই, বন্ধু, ছেলেপেলে, প্রিয় নেতা—এদের সবার নাম করি দিনের মধ্যে শত শত বার, কিন্তু তাঁর নাম করি না, তাঁকে বোধ করতে চাই না অনুসরণের মধ্যে দিয়ে। যাঁকে আপন করা উচিত ছিল তাঁকে চাইনি। উৎস যিনি তাঁকে না চাওয়ায় তাঁর কতখানি ব্যথা—সেই ব্যথাটাই কি ওইভাবে আমাদের জীবনে গড়িয়ে আসে প্রিয়জনের অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে। কি জানি তাঁর কি বিধান!

যাঁকে absolute (অখণ্ড) কই, অনন্ত, অসীম, আত্মা, ভগবান, খোদা, ব্রহ্ম, God (ঈশ্বর) ইত্যাদি কই, তাঁর স্পর্শ আমরা কিন্তু পাই সদগুরু বা কামেল পীরের ভিতর দিয়ে। রসুলের ভিতর দিয়েই তাঁর পথ। তাঁকে ধরেই যেতে হবে তাঁতে। প্রত্যেকটি মহাপুরুষই তিনি। একজনকে স্বীকার করতে গিয়ে অন্যকে অস্বীকার বা খাটো করলে তাঁকেই অস্বীকার করা হয়—নেমকহারামি হয়। মহাসম্রাট absolute (অখণ্ড) যিনি, তিনিই পাঠান প্রত্যেককে গ্লানি মোছাতে, সত্য বুঝিয়ে দিতে, জীবনবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত ও নিরাবিল করতে, আরোর আলোক দিতে—যখন যেমন প্রয়োজন। তিন ভাই এক বাপের সৃষ্টি, দেখতে হয়ত মিল নাই, কিন্তু সবাই একের থেকে উৎকৃষ্ট। উদ্ভব তাদের আলাদা নয়, যদিও দেখতে আলাদা। তিনিই আসেন যুগে যুগে। তিনি সব জানেন, আমরা জানি না। তিনি নানা ভাষায় তাঁর স্বরূপ ব্যক্ত করেন, কিন্তু আমরা তাঁর মত করে তাঁকে চাই না। আমরা প্রেরিতকে আমাদের বৃত্তি অনুপাতিক টেনে নামাই আমাদের কাম বাসনা যাতে পরিপূরিত হয় তেমনতর করে। ফলকথা, আমরা তাঁকে চাই না, চাই তাঁকে দিয়ে নিজেদের বৃত্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে। আমরা যদি তাঁর মনোমত হ'য়ে চলতে নারাজ হই, তখন আমাদের প্রবৃত্তিই হয় নিজেদের মনোমত ক'রে তাঁর বিকৃত রূপ পরিবেশন করতে। তাতে সপরিবেশ নিজেরা বঞ্চিত হই এবং তাঁকেও বঞ্চিত করি। তাঁর মহাআবির্ভাবকে ব্যর্থ ক'রে দিতে আমরা কিই না করি। অকৃতজ্ঞতা থেকেই এটা হয়, আমাদের ভিতর কাপট্য

আসে। তাই মতলব করে মহাপুরুষের কথাগুলিকে আমাদের সুবিধা মাফিক অর্থ করি।

আজকাল ঐক্যের বদলে ভেদকেই বড় ক'রে দেখানো হয়। নবাবের কাছ থেকে ইংরেজ যখন রাজত্ব নিল, তখনও কিন্তু হিন্দু-মুসলমান পরস্পর কেউ কাউকে ত্যাগ করেনি। পরে যত ভেদ দেখান হ'ল ততই গোলমাল শুরু হ'ল। একজনেরই পাঁচটি ছেলের প্রত্যেকের কাছে তার বাবাকে আলাদা-আলাদা বলে দেখান হ'ল। শয়তানি আর কাকে বলে! গ্লানি, ঈর্ষা, হিংসা, প্রবৃত্তি প্রভুত্ব দুঃখ দৈন্য—সবই একে একে পয়দা হ'তে লাগল এই অজানদের কারসাজিতে। যা বিচ্ছিন্ন করে, বিধ্বস্ত করে, ক্ষয় করে, পাতিত করে আমাদের সত্তাকে তাকেই বলে শাতন বা শয়তান। আমরা যারা সত্তাকে ভালবাসি তারা কখনও শয়তানের চেলা হ'তে পারি না। আমরা যদি বাঁচতে চাই তবে নিজেদের জীবনের মতই অন্যের জীবনকে দেখতে হবে। সবাই যাতে বাঁচতে পারে ফিঙ্গে হয়ে তা' করতে হবে। একেই বলে Sublimation (ভূমায়িত হওয়া)। তাঁতে আমাদের অনুরাগ যত কেন্দ্রীভূত হবে, ততই আমরা পারিপার্শ্বিককে নিয়ে ভাল থাকার সামর্থ্য অর্জন করব। এতে আমাদের প্রত্যাশা কম থাকে, জ্ঞান ও ভালবাসা বেড়ে যায়, প্রত্যেকের জন্য আমাদের করণীয় করি, কিন্তু সেটা আসক্তি থেকে নয়, করার উদ্দেশ্য থাকে ইষ্টকে প্রীত করা, তাই আমরা তখন আঘাতও কম পাই। দিশেহারাও হই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল বাংলোর মাঠে ইজিচেয়ারে এসে বসেছেন। গরমের দিন তাই শ্রীশ্রীঠাকুর ঘামছেন। হরিপদদা (সাহা) মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘাম মুছে দিচ্ছেন। সুধাপানিমা একখানি বড় পাখা দিয়ে তাঁকে হাওয়া করছেন। সরোজিনীমা তামাক, জল, সুপারি ইত্যাদি দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীবড়মা অদূরে বারান্দায় বসে আছেন। মায়েদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। এবং অনেকেই তাঁকে প্রণাম করতে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে অন্নদা-দা (হালদার), তারকদা (ব্যানার্জি), মণিদা (কর), নিরাপদদা (পাণ্ডা) চারুদা (করণ), হিরন্ময়দা (মুন্সী), সুরেনদা (সেন), সুনীতিদা (পাল), ক্ষিতীশদা (চৌধুরী), ত্রৈলোক্যদা (হালদার), বলরামদা (ঘোষ), গুরুদাসদা (ব্যানার্জি), ধীরেনদা (রাহা), কেদারদা (রায়), অমূল্যদা (দাস), অমলেন্দুদা (ব্যানার্জি), ধনঞ্জয়দা (পাল), মনোরঞ্জনদা (চ্যাটার্জি), মনোরঞ্জনদা (ব্যানার্জি), পঞ্চাননদা (চৌধুরী), জিতেনদা (রায়), বিনয়দা (বিশ্বাস), কামাক্ষ্যাদা (ভট্টাচার্য্য), ক্ষীতিশদা (দাস), শিবকালীদা (সাহা), হীরেনদা

(ঘোষ), মধুসূদনদা (সান্যাল), মন্মথদা (দে), শীতলদা (চক্রবর্তী), ধীরেনদা (তালুকদার), সত্যেনদা (চ্যাটার্জি), যতীনদা (দত্ত), আশুদা (জোয়ারদার), বঙ্কিমদা (ঘটক), বিনোদদা (সিংহ), বীরেনদা (ধর), হরেণদা (রক্ষিত), নরেশদা (চ্যাটার্জি), করুণাদা (মুখার্জি), শিবশঙ্করদা (চ্যাটার্জি), শশাঙ্কদা (মণ্ডল), কেষ্টদা (ব্যানার্জি), ক্ষেত্রদা (ব্যানার্জি), জগৎদা (চক্রবর্তী), শিবরামদা (চক্রবর্তী), গোপালদা (ঘোষশাস্ত্রী), অমৃতদা (হালদার), ব্রজেনদা (ঘোষ), বদ্রীবিশালদা (শ্রীবাস্তব), যতীনদা (মুখার্জী), অমরদা (ঘোষ), কুমুদদা (দাসপুরকায়স্থ), চতুর্ভুজদা (উপাধ্যায়), ভজহরিদা (পাল), গিরীন (চ্যাটার্জী), দিগম্বরদা (মণ্ডল), সুধীরদা (বিশ্বাস), সুধীরদা (চ্যাটার্জী), হরিপদদা (সেনগুপ্ত), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), ভূপেশদা (গুহ), দুলালদা (নাথ), হরেণদা (ব্যানার্জী), বিপিনদা (সেন), সুবোধদা (সেন), জনার্দ্দনদা (বসু), গয়ারাণীমা, যুঁইমা, উমামা ইত্যাদি বহু দাদা এবং মা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সমবেত।

পর পর অনেকে এসে নিজেদের সুখ দুঃখ ও সমস্যাদির কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেককে যথাযথ নির্দ্দেশ দিয়ে আশা ভরসায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলছেন।

একটি মা তাঁর পারিবারিক নানা অসুবিধার কথা জ্ঞাপন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে বললেন—আচার, নিয়ম, ব্যবহারে ভাল হ'য়ে চলবি। এমনভাবে চলা লাগে যাতে তোর পরম শত্রুও তোকে শ্রদ্ধা ক'রে সুখী হয়। ইষ্টনিষ্ঠা অটুট রেখে আশেপাশের সবাইকে যদি আপন ক'রে নিতে পার, দেখবে তাহ'লে তারা স্বভাবতই তোমার সহায় হবে। ব্যবহার হওয়া চাই মনকাড়া, প্রাণকাড়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), নরেনদা (মিত্র), সুরেনদা (বিশ্বাস), ননীদা (চক্রবর্তী), যতীনদা (দাস), কালিদাসদা (মজুমদার) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা-প্রসঙ্গে বললেন—আমি ভাবি আপনারা শুনলেন খুব, কিন্তু করলেন কম। আমি থাকতে থাকতে যদি প্রাণপণে করতেন, তাহ'লে অনেকখানি হত।

কেষ্টদা—আগে পড়া না থাকলে পরীক্ষার আগে পড়াশোনার অবস্থা যেমন হয়—কোনটা পড়ব ঠিক পাওয়া যায় না—একটা ধরতে মনে হয় আর একটা হয় নি—কোনটাই ভালভাবে পড়া যায় না,—আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগের থেকে গলদগুলি যদি adjust (নিয়ন্ত্রণ) করে

আসতেন, তাহ'লে আজ এ অবস্থা দাঁড়াত না।

কেষ্টদা—যখন যেটা বলতেন তখন-তখনই তা যদি করা হত !

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে গুরুতর কাণ্ড হত।

কেষ্টদা—এখন ঠিক করা যায় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্যজনকভাবে একটু হাসলেন। পরে বললেন—তেমন ইচ্ছা জাগলে কী না হয় !

রাত্রি দশটার সময় প্রফুল্ল কেষ্টদাকে বলল—কার্য্যসূচীতে সন্ধ্যা সাতটার সময় একটা কর্ম্মী বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তা কি আজ হবে ?

কেষ্টদা—মায়েদের meeting (সভা)ই তো এখনও শেষ হল না, ওটা আজ আর হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে সমস্ত meeting-এর (সভার) কথা programme-এ (কার্য্যসূচীতে) দিয়ে দেন, তাতে সময় মত attend (যোগদান) করাই লাগে। নচেৎ ওতেও একটা go-between (কথার খেলাপ) হয়। আত্মশুদ্ধির জন্য প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি ব্যাপারে সাবধান হ'তে হয়।

শরৎদা—হঠাৎ খেলাধূলার একটা ব্যাপারের আজকের দিনে নূতন করে ব্যবস্থা হওয়ায় কার্য্যসূচীর ওলট-পালট হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব জিনিসটা চোখের পর direct supervision-এ (প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণে) রাখা লাগে, কারও উপর নির্ভর ক'রে বসে থাকতে নাই। নিজেদের একচুলও খাতির করতে নেই। জানবেন যা-কিছু দোষ হয়, তার জন্য আপনারা কর্তাব্যক্তিরাই দায়ী। নিজেদের deviation (বিচ্যুতি) না শোধরালে সব কাজ সুশৃঙ্খলভাবে হ'তে পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে যতীনদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—সব চাইতে কঠিন ব্যাপার হ'ল-নিজের ভুল নিজে ধরা। obsession (অভিভূতি) থাকে কিনা, তাই ধরা যায় না সব সময়।

যতীনদা—আমি খুব কঠোরভাবে চলতে চেষ্টা করি কিন্তু কোন বাধা পেলে মনে আঘাত লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেও complex-এর (প্রবৃত্তির) ব্যাপার। কোন দুর্বলতাকে খাতির করা চলবে না।

মোহন একটা কাজের ব্যাপারে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—কোন জিনিসের দায়িত্ব নিলে পুরোপুরি নিখুঁতভাবে তা' করা লাগে। কাজে হাত দিলে তা' সমাধা করা লাগে, সম্পূর্ণ শেষ করা লাগে,

নচেৎ মাঝপথে ছেড়ে দিলে তাতে ভাল হয় না, বরং ঐ অভ্যাস ছড়িয়ে পড়ে অন্য ব্যাপারেও।

নরেনদা—আপনি পরস্পরের দোষ ধরিয়ে দেওয়ার কথা বলেন, কিন্তু অপরের দোষ ধরাতে গেলে তো অনেক সময় মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দোষ ধরানর ফয়দা আছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

মানুষকে দোষী করার জন্য
দোষ ধরান ভাল না,
দোষ সংশোধনের জন্য
দোষ দেখিয়ে দেওয়া ভাল—
শুদ্ধ মনে—প্রীতির সহিত ;
দোষ দেওয়ার জন্য দোষ ধরা হ'লে
মানুষের হীনম্মন্য আক্রোশ জেগে ওঠে,
তাতে তার সংশোধন হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বাণীটি পড়তে বললেন। পড়া হল এবং এই সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল।

৪ঠা বৈশাখ, রবিবার, ১৩৫৬ (ইং ১৭।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এবং যতিগণ তাঁর পদপ্রান্তে উপস্থিত।

কাল রাতে পরস্পর দোষ ধরিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে যে বাণীটি শ্রীশ্রীঠাকুর দিয়েছেন সে বিষয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যে আপনাদের পরস্পরের মধ্যে দোষ ধরিয়ে দেওয়ার কথা বলি, তা' বলি প্রত্যেকের সংশোধনের জন্য। আমরা যাতে পরিশুদ্ধ হতে পারি, তার জন্য ব্যক্তিগত ও গুচ্ছগতভাবে চেষ্টা করা লাগবে। অন্যের কাছে আমি কেমন এবং আমার কাছে আমি কেমন এই দুই দিক দিয়ে জিনিসটা দেখতে হবে। এই দুই দিকের সঙ্গতি না হলে হবে না।

কেষ্টদা—নিজের কাছে নিজে খারাপ হয়ে যদি অন্যের কাছে ভাল হয়, সেটা কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে হল না।

একটু বাদে জনৈক ভাই এসে বললেন—কামচিন্তা তাড়াতে এত চেষ্টা করি কিন্তু পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা করিস কী? অবজ্ঞা করতে হয়, চেষ্টা করতে গেলে পেয়ে বসে। নিজের পথে চলতে হয়, অন্য কাজে লেগে যেতে হয়। কামের কথা শুনতেই নেই। বলি যদি করব না এবং আসলেও যদি আমল না দিই, অন্য কাজে নিজেকে নিয়োজিত করি তখন-তখনই, তাহ'লে আমার নাগাল পায় কি করে? এর চাইতে সোজা পথ আর নেই। নিজের সিদ্ধান্তটা ঠিক থাকলে ভাবনা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর ধর্ম্মসঙ্গত কামচর্য্যা সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন। তারপর বাণীটি পড়া হ'ল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্ত্রী-সহবাস করলে পরেই ভিতরের intent (উদ্দেশ্য) থাকা চাই সুপ্রজনন। তা' sacrifice করে (বিসর্জ্জন দিয়ে) যারা সম্ভোগ করে, তারা সর্ব্বনাশের আবাহনী গায়। অবশ্য স্ত্রীর স্বাভাবিক চাহিদা-পূরণার্থে উপগত হ'লে সুপ্রজনন ব্যাহত হয় কমই।

শরৎদা—পশুদের দেখা যায় যে যৌন মিলনের বিহিত কাল ছাড়া অন্য সময়ে তারা মিলিত হয় না। মানুষ বড় হয়েও অসংযত চলনে চলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত rational (বিচারশক্তিসম্পন্ন) হয়, complex (প্রবৃত্তি)-টা ততটা free (স্বাধীন) অর্থাৎ voluntary (স্বীয় ইচ্ছাধীন) হয়। ওদের অনেকটা বেশি circumscribed (সীমাবদ্ধ)। ওরা obsessed (আবিষ্ট) কিনা সেই জন্য ওরা educated (শিক্ষিত) হয় কম। মানুষের মননশক্তি ও বিচারবুদ্ধি থাকায় সে educated (শিক্ষিত) হয় বেশি। Educated (শিক্ষিত) হয়, অথচ যদি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) না হয়, তাহ'লে disintegrated (বিশ্লিষ্ট) হ'য়ে যায়। মানুষের অল্পবিস্তর স্বাধীনতা থাকায় যেমন তার উন্নতিও হ'তে পারে, তেমনি তার অবনতিও হ'তে পারে। পশুদের এ বালাই নেই বললেই হয়, তবে pedigree (বংশধারা) অনুযায়ী একই জাতের পশুদের মধ্যে আচরণের কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। মানুষের মধ্যে gradation (ক্রম) দেখতে গেলে, দেখতে হয় কার complex-এর (প্রবৃত্তির) কতখানি fulfilling and meaningful adjustment (পরিপূরণী এবং সার্থক নিয়ন্ত্রণ) হয়েছে। তাছাড়া আরও দেখতে হবে সেগুলি কতখানি unicentric (এককেন্দ্রিক) হ'য়ে কতখানি sublimated (ভূমায়িত) হয়েছে। এইটে যার যত বেশি হয়, সে ততখানি great man (মহান মানুষ)।

সেই জন্য education-এর (শিক্ষার) মূল হ'ল শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে নিজেকে

নিরখ-পরখ করা এবং দোষত্রুটিগুলি actively (সক্রিয়ভাবে) adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে এমনভাবে বিকশিত করে তোলা যাতে, সুষ্ঠুভাবে দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশকে প্রয়োজন-পূরণী সেবা দেওয়া যায়।

কেষ্টদা—অনেক সময় দেখা যায় কেউ হয়তো adjusted (নিয়ন্ত্রিত) নয়, অথচ খুব efficient (দক্ষ)। মদ খাচ্ছে অথচ খুব বড় ডাক্তার, মদ খেলে হয়তো ডাক্তারি ফোটে ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Complex-এর (প্রবৃত্তির) ঠেলায় চলেছে। একটা দিকে efficiency (দক্ষতা) বেড়েছে, অন্য দিকে stunted (বৃদ্ধি ব্যাহত) হয়েছে। যাদের complex (প্রবৃত্তি)-গুলি যত বেশী flcker (ইতস্ততঃভাবে পরিভ্রমণ) করে তাদের পক্ষে মন concentrate (একাগ্র) করা তত দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে। তাই মদ-টদ খায় যাতে চাঞ্চল্যটা তখনকার মত temporarily (সাময়িকভাবে) benumbed (বিবশ) হওয়ায় মন একাগ্র করতে সুবিধা হয়। কিন্তু তার effect (ফল) ভাল হয় না। তান্ত্রিক সাধক যেমন মদ খায়। মদের নেশাজনিত concentration-এর (একাগ্রতার) মধ্য দিয়ে যে achievement (প্রাপ্তি) হয়, তা' কিন্তু সত্তায় গাঁথে না, স্বভাবে দাঁড়ায় না, স্বভাবসিদ্ধ হয় না। মহাপুরুষদের জীবনের achievement (প্রাপ্তি) যা'-কিছু সে-সব কিন্তু তাঁদের জীবনে স্বভাবসিদ্ধ—যেমন বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণদেব এবং অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবনে আমরা দেখতে পাই।

৫ই বৈশাখ, সোমবার, ১৩৫৬ (ইং ১৮।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে আছেন। নানাস্থানের কর্ম্মিবৃন্দ তাঁর কাছে সমবেত হয়েছেন, কাজকর্ম্ম সম্পর্কে উপদেশ ও নির্দ্দেশ গ্রহণের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতার কতিপয় কর্ম্মীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কাজ করা লাগে। তাদের মধ্যে কাজ করতে পারে এমন ধরনের কর্ম্মী যোগাড় করতে হয়। এদের মধ্যে যারা কাজ করবে তাদের জানা চাই এদের সমস্যা কী এবং তার সমাধান কি ক'রে হতে পারে—অবশ্য তা' আমাদের stand point (দৃষ্টিভঙ্গী) অনুযায়ী। প্রকৃত কল্যাণকামী মানুষ এদের হৃদয় কেড়ে নিতে পারে। তাদের কথায় তখন এরা ওঠে-বসে। এদের মধ্যে দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়ান লাগে। দীক্ষা না দিলে permanant effect (স্থায়ী ফল) হয় না, sentiment (ভাব) জাগে না।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর সমবেত কর্ম্মীদের দিকে চেয়ে বললেন—বিশিষ্ট দেড় লাখ লোক যারা দৈনন্দিন অন্তত তিন টাকা করে ইষ্টভৃতি করবে—দীক্ষিত ক'রে তোলা চাই। এখন তোমাদের পক্ষে খুব ভাল সময় যাচ্ছে।

আর কতকগুলি সন্ন্যাসী ও যতি ধরনের কর্ম্মী সংগ্রহ লাগে। জাগরণী ও সায়ন্তনী গাওয়ার প্রথা সর্বত্র প্রবর্তন করা লাগে—এক-এক দলে তিন জনের বেশী লাগে না।

তিন হাজার কৃষ্টিবান্ধব যথাসত্বর করতে হয়। এমন লোক চাই যারা কিছুতেই ছাড়বে না। তিন হাজার টেকাতে গেলে ছয় হাজার লোক সংগ্রহ করা লাগে। অন্তত তিন হাজার হ'লে আমরা কাজ আরম্ভ করতে পারি। প্রধান কাজ হ'ল ভাবধারাগুলি খবরের কাগজের মাধ্যমে রোজ ছড়ান। কী করতে হবে, তা' মানুষ জানে না বোঝে না, তাই বিপথে বিভ্রান্ত হয়।

বিয়ের কথা বলা লাগে—মেয়েকে ছোট ঘরে দিবি না—তোর মেয়ে বড় ঘরে দে, এতে সেও প্রকৃত বড় হবে তুইও বড় হবি। বড়র মেয়ে আবার তুই যদি আনিস তাতেই কিন্তু নষ্ট পাবি। এইভাবে জনে-জনে বলা লাগে, ধরিয়ে দেওয়া লাগে। Sentiment (ভাব) নষ্ট করলে মানুষ মুরগী হ'য়ে যাবে অর্থাৎ সংহতি ব'লে কিছু থাকবে না, বৈশিষ্ট্য ব'লে কিছু থাকবে না। তখন অপরে যদৃচ্ছা কোতল করতে পারবে তাদের।

সাধারণের মধ্যে দীক্ষা খুব বাড়ান লাগে। আর বিশিষ্ট দেড় লাখের জন্য ব্যবসাদারদের মধ্যে চেষ্টা করা ভাল।

একটা ফ্ল্যাট মেশিন জোগাড় করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে প্রসন্ন বদনে বললেন—সৎসঙ্গ আন্দোলন এমন একটা জিনিস যা প্রতিটি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খায়। এতে একের কল্যাণ করতে গিয়ে অপরের ক্ষতিসাধনের কথা ভাবতে হয় না।

কেষ্টদা—সেটা সত্তার দিক থেকে। বহু রাজনৈতিক আন্দোলন complex-এর (প্রবৃত্তির) দিক থেকে কথা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—সত্তার চাইতে বড় প্রবৃত্তি আর নেই। তার মানে বাঁচার চাহিদা প্রতিটি জীবের মধ্যে অনুস্যূত।

কেষ্টদা—ভাতের চাইতে মদের নেশা বড় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে বেঁচে থাকলে তো complex-enjoyment (প্রবৃত্তি-উপভোগ)। পেটে ভাত না থাকলে আবার মদের নেশাও ছুটে যায়। এই কাজগুলি করা চাই শোরগোল না করে। বাইরে থেকে কেউ ঠিক পাবে না, তলে-

তলে কাজ হয়ে যাবে। পদ্মার ভাঙ্গন যেমন হয়, আগে কিছু ঠিক পাওয়া যায় না। হঠাৎ দেখা যায় অনেকখানি জমি নদীর মধ্যে চলে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গত বললেন—কুটীরশিল্পের উপযোগী ছোট ছোট কতকগুলি যন্ত্র তৈয়ারী করা লাগে। বাড়ীতে বাড়ীতে কুটীরশিল্প ক'রে মহাযন্ত্রের ব্যবহার যত কমিয়ে দেওয়া যায় ততই ভাল। তাতে এক-একটা বাড়ী ছোট-ছোট শিল্পকেন্দ্র-রূপে গ'ড়ে উঠতে পারে। তখন প্রত্যেকেই শ্রমিক আবার মালিক। তাতে মালিক-শ্রমিক সমস্যার একটা automatic coordination (স্বাভাবিক সমন্বয়) হ'য়ে যায়। এক দল আরেক দলকে ফাঁকি দিতে চায়, আর একদল এক দলকে চুষে সাবাড় করতে চায়—সে problem (সমস্যা) থাকে না।

জনৈক কর্ম্মী জিজ্ঞাসা করলেন—প্রতিযোগিতার বাজারে পারা যাবে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইভাবে না করলে পারার যো নেই। জাপানীরা যে এত সস্তায় জিনিস দিতে পারে, তাও কুটীরশিল্পের ভিত্তিতে করে বলে। ওদের শুনেছি দিনের বেলায় যেটা কারখানা রাত্রে সেটা শোয়ার ঘর। ওদের দেশে ধর্ম্ম-ঘটের কথা শোনা যায় কম। তোমরা যদি তেমনভাবে organised (সংগঠিত) হও, ওরা যা একশ' টাকায় দিচ্ছে তোমরা তা' ষাট টাকায় দিতে পারবে।

দেড় লাখ হ'য়ে গেলে, কুটীরশিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর জন্য তিনমাস অন্তর অন্তর হাউড় দিয়ে কিছু কিছু সংগ্রহ ক'রে এক-একটা ফ্যাক্টীর গ'ড়ে তুলতে পারব। Finer and finer (সুন্দর হ'তে সুন্দরতর) যন্ত্র evolve (উদ্ভাবন) করবার জন্য আবার Research Scholar (গবেষণা-কর্ম্মী) রাখা লাগবে।

মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভালভাবে কাজ করা লাগবে। মুসলমান যাতে প্রকৃত মুসলমান হ'তে পারে আমাদের সেই চেষ্টা করা লাগবে। নিজেদের কোরান, হাদিস, এবং ইসলাম-প্রসঙ্গ ভাল ক'রে প'ড়ে নিয়ে ইসলাম সম্পর্কে ভুল প্রচার যা হচ্ছে তার নিরসন করতে হবে।

ফণীভাই (ভট্টাচার্য্য) তার ব্যক্তিগত সমস্যার কথা উত্থাপন করায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমার চালচলন, আচার-ব্যবহার, ওঠাবসা, কথা বলা সবটাই এমন হবে যাতে তোমার পরম শত্রুরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, চরিত্রটাই ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন ক'রে তোলা লাগে। তাতে মানুষ স্বতঃই তোমার প্রতি সশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠবে। এটা যত হবে ততই তারা তোমার ইষ্টে অনুরক্ত হবে। মানুষ উপায় করতে পারলে আর ভাবনা নাই।

দুজন কর্ম্মীর মধ্যে একটু বিরোধের সূত্রপাত হয়েছে সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর

বললেন—এমন কতকগুলি লোক থাকে যারা এর কাছে এক কথা বলে, তার কাছে আর এক কথা বলে। এইভাবে গোলমাল পাকিয়ে তোলে। সব সময় হয়তো মোকাবিলা করার সুযোগ থাকে না, কিন্তু কর্ম্মীদের পরস্পরের মধ্যে এমন হৃদ্যতা ও বিশ্বাস থাকা চাই যে, একজনের কাছে আরেক জনের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে গেলে সে যেন ঠাঁই না পায়। তখন-তখনই adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে দিতে হয়। বলতে হয়—সে কখনও এমন কথা বলতে পারে না, কিংবা এমন কাজ করতে পারে না এবং যদি এমন কিছু বলে বা করেও থাকে তাহ'লেও তার intention (উদ্দেশ্য) তুমি বুঝতে পারনি। তাকে আমি ভালভাবেই জানি।

চা খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ কেউ বললেন—ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ বললেন—ছাড়তে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাড়া মানে, ছাড়লাম বলে ও পথে আর যেতে নেই, এই হয়ে গেল। টোটকা-টোটকা ঐ গুলি পর্যন্ত মানুষ লক্ষ্য করে এবং আমাদের মধ্যে সদভ্যাস দেখলে অন্যেও সেগুলি ধরে। তাই ঋত্বিকের চরিত্র হওয়া চাই typical (আদর্শস্বরূপ)—একেবারে নিখুঁত। কথার সঙ্গে চলন যত coordinated (সঙ্গতিপূর্ণ) হয়, তত মানুষ মনে করে—এ মানুষ দেখতে আমাদের মত, কিন্তু আমাদের মত নয়।

সংহতি-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঋত্বিকের সম্মান ঋত্বিক নষ্ট করবে না কিছুতেই। যদি ঋত্বিকের সম্বন্ধে কিছু বলার থাকে তা' সৎসঙ্গীদের কাছে বলা ঠিক নয়। সর্বপ্রথম তাকে privately (গোপনে) directly (সরাসরি) বলা ভাল—তার পরিশুদ্ধির জন্য। যদি তাতে ফল না হয় তবে এখানে এসে যতি সঙ্ঘের কাছে বলে বিহিত ব্যবস্থা করবে।

যতীনদা (দাস)—ঋত্বিকদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড কেমন হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের হওয়া চাই self imposed (আত্মনির্ধারিত) প্রায়শ্চিত্ত ও শাস্তি। নিরখ-পরখের কথা আমি সেইজন্য অত ক'রে বলি।

বিভিন্ন বর্ণের যতিদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার কোনও তারতম্য আছে কিনা সেই প্রশ্ন ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সন্ন্যাসী যখন হয় বিরজা হোম ক'রে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে ক'রে নেয়। মাতা পিতা বা বংশের পরিচয় দেয় না। তখন যেন প্রেতদেহ। একটা মহৎ ভাব দ্বারা পুরোপুরি possessed (আবিষ্ট) হ'লে সত্যিই তাই হয়। মানুষ নিজেতে যেন আর নিজে থাকে না। তবে আমি আপনাদের

এখনও পৈতা-টৈতা ফেলতে বলি না, গেরুয়া পড়তে বলি না। সেটা যুগের দিকে চেয়ে—কারণ তাহ'লে লোকে ঐ ধাঁজ ধরবে। অবশ্য প্রয়োজন হ'লে তা' করতে পারেন। তবে আমার মনে হয়—"সন্ন্যাস কইনু যবে ছন্ন হল মন, কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন।" আমি যেভাবে যা করতে বলেছি সবগুলি সেই-ভাবে ঠিক ক'রে করা লাগে। যতিদের সামাজিক মর্যাদা প্রধানত নির্ভর করে তাদের চরিত্র ও তপপ্রাণতার উপর, তারা কারও প্রণাম নেবে না। তবে যতিদের প্রত্যেকেরই উচ্চবর্ণ বয়োঃজ্যেষ্ঠ এবং মাননীয় ব্যক্তিকে বিহিত মর্য্যাদা দান ক'রে চলা উচিত।

কেষ্টদা—ছাড়াটায় তো ইষ্টপ্রাণতা বাড়ে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টপ্রাণতার জন্য ছাড়াটাই রাজ-ছাড়া।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রবৃত্তিমুখী deviation (বিচ্যুতি) একবার একটা হ'লে আবার সেই পর্ব্বের glow (জেল্লা) ফিরিয়ে আনতে সময় লাগে একটা দাগা দিয়ে যায় কিনা! তাই অহরহ ইষ্টানুগ চলনে মত্ত হ'য়ে থাকা লাগে সজাগ হ'য়ে যাতে স্খলন হ'তে না পারে। শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে আগ্রহভরে বললেন—আমাদের জানা চাই—আমরা কেন কী করি। তখন এই বোধ থাকার জন্য বলা যায়—স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী মানুষের কোথায় কী করা প্রয়োজন। এই বোধ ও জ্ঞান থাকলেই মানুষের মধ্যে সৎ-নীতিগুলি ঠিকভাবে infuse (সঞ্চারিত) করা যায়।

কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত ছোট বাণীটি দিলেন—

প্রবৃত্তির এতটুকু প্রশ্রয়
তোমার নিরাশ্রয় হওয়ার পথ
আলগা ক'রে দেবেই কি দেবে—
তাই সাবধান থেকো কিন্তু।
চেতন থেকো।

এখন বেলা পৌনে এগারটা।

কেষ্টদা বললেন—প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ হ'লেই তো সহনপটু হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যাস করা লাগে। নিজেকে খাতির করতে নেই। আমি সেই ফোস্কা পড়া পা নিয়েই কুষ্টিয়া যাতায়াত করেছি পর পর কদিন নিজের দুর্ব্বলতাকে অগ্রাহ্য করে। সব জিনিসটা বাস্তবে ক'রে ক'রে আয়ত্ত করা লাগে। যেমন মিটিং-এ যাবেন – কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় যেতে হয়। বিশ-পঞ্চাশ বার অমন গেলে লোকেও ঠিক পেয়ে যায় এবং সেইভাবে অভ্যস্ত হয়। সব কাজ নিজে

করতে অভ্যাস করতে হয়। যেমন হয়তো নিজে ডেগটা মাজলেন যদি পারেন। আগে আমি কাউকে আমার কিছু করারই অবকাশ দিতাম না, নিজেই সব করতাম। মা থাকলে আবার সব অভ্যাস করতাম। এখন আছি প্রাণে বেঁচে। কি কাজ সে বাঁচা বেঁচে?

শেষের কথাগুলি বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠ কান্না-ভেজা হ'য়ে উঠল। আয়ত আঁখিযুগল অশ্রুসজল হ'য়ে উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতিদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—যতিচর্য্যা ও অষ্টশীল নিজেদের কাছে লিখে রাখা লাগে। রোজই খুলে দেখতে হয় ও ভাবতে হয়—কোন্‌টা কতদূর আয়ত্ত হ'ল। আবার দৈনন্দিন জীবন-চলনার মধ্যে দেখতে হয়—ঐগুলি পরিপালিত হচ্ছে কিনা। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে চলা, বলা, ভাবা ঠিক থাকে কিনা তা' সচেতনভাবে পরীক্ষা করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই যতি হবি নাকি?

চুনীদা (রায়চৌধুরী) নিরুত্তর।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—চুনী হলে ওর আরো কঠোরভাবে নিয়মনীতি পালন করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে বার বার বলতে লাগলেন—মহাবোধিসত্ত্ব, মহাবোধিসত্ত্ব, মহাবোধিসত্ত্ব।

তাঁর ভাবাবিষ্ট কথন শুনে উপস্থিত সবার অন্তরে এক নিগূঢ় দিব্য ভাব সঞ্চারিত হ'য়ে গেল।

কথায়-কথায় বোধগয়া ও বোধিবৃক্ষের কথা উঠল।

প্রফুল্ল—রামকৃষ্ণদেব বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করতে যান নি। তিনি বললেন—এ দেহ সেখান থেকে এসেছে, সেখানে গেলে লয় হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি গয়ায় গিয়েছিলাম কিন্তু বিষ্ণুপাদপদ্মে আমিও যাই নি। আমারও ওরকম মনে হ'ত। সে জায়গা চিনিও না আমি।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—বুদ্ধদেবের রকমটাও আমার মধ্যে কিছু কিছু আছে। কিন্তু সেটা unfold (প্রকাশ) করিনি বেশী। মাঝে মাঝে একটু-আধটু বলি।

কেষ্টদা—আপনার কথাগুলি অন্যভাবে বলা আছে। আপনি বলেছেন—স্বাধিকার উপভোগের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভোগের কথা কই, কেমনভাবে কইছি দেখছেন তো? ওর মধ্যে ওই-ই আছে। মানুষের normal development (স্বাভাবিক বিকাশ)

যেমনভাবে হয়, তাই-ই বলিছি। আছি, থাকতে চাই। সুষ্ঠুভাবে থাকাটার স্বার্থকতা আর নেই। থাকাটা সপারিপার্শ্বিক না হ'লে, তা' আবার সফল ও সবল হয় না। আমি আছি আর কেউ থাকল না—তা' হবে না। তাতে আমার থাকাটাও থাকবে না। এই থাকাটার পথে দুঃখ আছে মানুষের, আবার তার প্রতিকারও আছে। সেই প্রতিকারের পন্থা হ'ল ইষ্টে অনুরাগ।

মতিদা (চ্যাটার্জী)—ঋষি, দ্রষ্টা ও মুনিতে তফাৎ কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋষিই দ্রষ্টা, ঋষিকেই দ্রষ্টা বলে অথবা বলা যায় দ্রষ্টাকেই ঋষি বলে। মুনিরা হলেন মননশীল, সন্ন্যাসী মানে সম্যকভাবে আদর্শে ন্যস্ত।

পরে যে আলোচনা হ'ল তার নিষ্কর্ষ নিম্নরূপ—

(১) দৈব, পুরুষকার এবং কাল এই তিনটের সংযোগে ভাগ্য রচনা হয়।

(২) উৎকট কর্ম্মের ফল তিন বৎসর, তিন মাস বা তিন দিনেও পাওয়া যায়।

(৩) সদ্‌গুরু যথাকালে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন ক'রে বিপদ্‌-আপদের প্রতিকার বাত্‌লে দেন। তখন পুরুষকারের সঙ্গে তাঁর নির্দ্দেশমত চললে কর্ম্মফল কেটে যেতে পারে।

(৪) রত্ন ও বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাদি ধারণে গ্রহবৈগুণ্যের কিছুটা প্রশমন হ'তে পারে। কিন্তু মূল জিনিস হচ্ছে—সুনিষ্ঠ, সক্রিয় ইষ্টানুসরণ।

৬ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৫৬ (ইং ১৯।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুর পশ্চিম দিকে ইজি চেয়ারে পশ্চিমাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট। ঈষৎ হাওয়ায় সামনের গাছগুলির পাতা অল্প অল্প আন্দোলিত হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনাভাবে গাছগুলির দিকে চেয়ে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বসতে না বসতেই লোকের ভিড় জমে গেল। তিনি হঠাৎ নিম্নলিখিত ছড়াটি বললেন—

নাম আর ধ্যানে উচ্চচিন্তা
করণ-কারণ যেমন.
জীব-জীবনের গতি-মুক্তি
হওয়া-পাওয়াও তেমন।

এই প্রসঙ্গে বললেন—মানুষের চিন্তা বাক্য ও কর্মে প্রতিফলিত হয়। যজন-শীলতার অভ্যাসে মানুষের চিন্তাধারা যত ইষ্টকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে, ততই তার বাক্

ও কর্ম ইষ্টানুগ ধাঁজ নেয়। ইষ্টচিন্তাপরায়ণতা স্বাভাবিক প্রবণতা যদি কারও ভিতর জেগে ওঠে, তাহ'লে তার চলা-বলার মধ্য দিয়ে তা' প্রকাশ পায়ই। তাই বলেছি যজন, যাজন ইষ্টভৃতির কথা। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি তিন-ই ঠিকমত করা লাগে। এই ত্রয়ী সাধনার অধিষ্ঠানভূমি হ'ল কিন্তু অনুরাগ-সমন্বিত যজন, এইটাই শিকড়, এই শিকড় জীবনের গভীরে গেড়ে যেয়ে অচ্ছেদ্য ও নিনড় হওয়া চাই। তাহ'লে শত ঝড়-ঝাপটাও আমাদের টলাতে পারে কমই।

কথা-প্রসঙ্গে প্রবোধদা (মিত্র) বললেন—বর্ণাশ্রমের মধ্যে কোনও inherent defect (অন্তর্নিহিত দোষ) ছিল, তা' না হ'লে বর্ণাশ্রম সত্ত্বেও আমাদের এ অবস্থা হ'ল কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর তেজোদ্দৃপ্ত ভঙ্গীতে বললেন—এতখানি defect (দোষ) ছিল যে তার এতখানি সর্ব্বনাশ করেও, তার নাভিশ্বাস উঠেও, আজও তা' টিকে আছে। এই যে এতকাল টিকে থাকল অত্যন্ত বিধ্বস্ত হয়েও, উপর্য্যুপরি নানা বিঘ্ন-বাধা বিপর্য্যয় ও বিপ্লবের ভিতর দিয়ে, তা' তার প্রচণ্ড প্রাণশক্তিরই পরিচয় দেয়। কত বৈদেশিক আক্রমণ গেল, বিজাতীয় শাসন গেল, হীনযান-মহাযান গেল, তা' সত্ত্বেও আজও যে রেশটা আছে সেই তো অবাক কাণ্ড। মানুষের একত্বের নামে ব্যক্তিগত, কুলগত ও বর্ণগত বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিয়ে যখন আমরা বিবাহের নীতিবিধিকে অবমাননা করতে লাগলাম, প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ হ'য়ে জীবিকার ব্যাপারে যথেচ্ছ চলনে চলতে লাগলাম, দরিদ্র সমাজ অনুশাসকদের অবজ্ঞা করতে শুরু করলাম, তখন থেকেই আমাদের পতন শুরু হল। আবার উচ্চবর্ণ যদি নিম্নবর্ণকে পর করে দিয়ে থাকে সেও আমাদেরই দোষ। সেটা বর্ণাশ্রমের বিকৃতি। সে দোষ বর্ণাশ্রমের উপর চাপান উচিত নয়। কত বড় বড় আন্দোলন হয়েছে, কত দিকপাল এ দেশে এসেছেন যারা বর্ণাশ্রমের মূল মর্ম না বুঝে একে বিভেদ ও বিদ্বেষমূলক একটা কুসংস্কার ব'লে ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন এর সর্বসমস্যা সমাধানী স্বরূপটি বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তি বিচার, ইতিহাস ও বাস্তব তথ্যের উপস্থাপন সহকারে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে ? বর্ণাশ্রমের বৈশিষ্ট্য দিয়েই ভারত একদিন দুনিয়াকে illuminate (আলোকিত) ক'রে তুলেছিল। আবোল-তাবোল কথায় কান না দিয়ে এই সত্যকেই সপ্রমাণ করতে চেষ্টা কর। এ বাধা বিধির দলিল। বর্ণাশ্রম যদি নষ্ট কর, তাহ'লেও সুশৃঙ্খলভাবে বাঁচার প্রয়োজনে আবার তার মূল নীতিগুলির শরণাপন্ন হতেই হবে, তা' যে নামেই কর না কেন। মোটকথা তপস্যা, বিবাহ, শিক্ষা, জনন, জীবন, জীবিকা এবং সমাজকে যদি সুবিন্যস্ত ক'রে না তোল

তাহ'লে কিছুতেই রেহাই নেই। ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের যতগুলি দিক আছে তার সবগুলি দিকই বর্ণাশ্রমকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের দেশে একদিন একসূত্র সঙ্গত সমাধান লাভ করেছিল। এটা ধিইয়ে বোঝা লাগে।

কলকাতার কেষ্টদা (চ্যাটার্জী) এবং তার দলের কয়েকজনের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভেবে দেখতে হয় আমরা কী, আমাদের কৃষ্টি কী, আমরা কী ছিলাম, আমাদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য কী। এগুলি আমাদের ভাল ক'রে দেখতে দেওয়া হয় নি। আমরা ভেবে বসে আছি যে বাইরে থেকে আমাদের কেবল নিতেই হবে, আমাদের দেওয়ার মত কিছু নেই। বর্তমানের নানা আন্দোলন আমাদের কৃষ্টিগত sentiment-এর (ভাবানুকম্পিতার) মাথায় ডাঙ্গশ মারছে, নানা deviation (বিচ্যুতি) সৃষ্টি করছে, কিন্তু আমরা যাতে আমাদের ঐতিহ্যের উপর দাঁড়াতে পারি তার কোন ব্যবস্থা করছে না। মিছরী করতে গেলে একটা সূতো লাগে। সেই সূতো ধরে দানা বাঁধে, নইলে সব আলাদা-আলাদা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে। আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা। মানুষগুলি সব বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে। কিন্তু কোনও common ideal (অভিন্ন আদর্শ) নেই—যাঁকে ধরে সবাই সংহত হ'য়ে উঠতে পারে। এই আদর্শকে মেনে চললে, একটা বোঁটা ঠিক থাকলে, লাখ খেয়োখেয়ি করেও নিজেদের মধ্যে কিছুটা মিল থাকে। আদর্শ না থাকলে কৃষ্টি থাকে না। কৃষ্টি হ'ল সেই অনুশীলন নিয়ে থাকা, যাতে আদর্শ আমাদের বাস্তব জীবনের সবকিছুর মধ্যে সঞ্জীবিত থাকেন। এমন আদর্শ চাই, যাঁর দ্বারা আমাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য-সম্মত সত্তা-সম্বর্দ্ধনা অব্যাহত থাকে। বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিয়ে সবাইকে একলা করতে গেলে হবে না, তাতে বাঁচা-বাড়াই মার খাবে। একজনের বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে সে আর সে থাকে না। পরমপিতার বিধানই এমন, যে প্রত্যেককে চলতে হবে তার বিশিষ্ট রকমে। তাই প্রত্যেককে তার নিজস্ব রকমে চলতে সাহায্য করাই প্রকৃত সত্তাপোষণী সেবা যা করা যায় তা' যদি সত্তাপোষণী না হয় তবে তার দাম কি ? ফের বলি—আমাদের বাঁচা কঠিন আছে যদি আমরা বৈশিষ্ট্যের উপর না দাঁড়াই, ধর্ম ও কৃষ্টিকে ধরে না চলি।

এরপর শিক্ষা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ লেখাপড়া শিখলেই তা' শিক্ষা হয় না, যদি তা' সত্তাপোষণী হয়ে adjusted (বিন্যস্ত) না হয়। আবার যা বৈশিষ্ট্য পরিপালী না হয়, তা' কিন্তু সত্তাপোষণী হয় কমই। আমি যতই দেখছি ততই আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে Indo-Aryan Communism (আর্য্য-ভারতীয় সঙ্ঘতন্ত্র)-এর মত সাচ্চা জিনিস আর নেই। তাতে প্রত্যেকটা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে সমষ্টি-বৈশিষ্ট্যের

পরিপূরণী করার ব্যবস্থা আছে। আর, এতে জীবনের সবকিছুই একসুতোয় গেঁথে তোলা হয়েছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে জীবনের কোন দিকটাই কোন দিককে বাদ দিয়ে নয়। আমাদের দেহবিধানকে দেখলেই হয়। দেহের প্রত্যেকটা অঙ্গই অন্যসব অঙ্গের সঙ্গে পারস্পরিক সূত্রে জড়িত। একটা জায়গায় গোলমাল হলেই দেহ অসুস্থ হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। এখন রোদ খাঁ খাঁ করছে। তা' সত্ত্বেও বহু লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আগ্রহভরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করছেন। তিনি যখন যেখানে থাকেন, কি যেন এক দুর্বার আকর্ষণে সেখানেই এসে মানুষ জড়ো হয়।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর যতিদের বললেন—মানুষ যেমন সব কাজের মধ্যে মনে মনে গান করতে পারে, তেমনি ইচ্ছা থাকলে সব কাজের মধ্যে নামও চালাতে পারে। কিছুদিন লেগে-বেঁধে অভ্যাস করতে হয়। দিন কয়েক করতে করতে মনটা স্বভাবতই আজ্ঞাচক্রে থাকে, চেষ্টা করা লাগে না, সমস্ত চিন্তা ঐ level (স্তর) থেকে হ'তে থাকে। এমন হয়, তাকিয়ে আছি—কিছুই চোখে পড়ছে না, একটা আবছা আলোর মত চোখের সামনে ভাসে শুধু।

যতীনদা (দাস)—অন্তশ্চক্ষু সক্রিয় হ'লে কি বাইরের চোখ নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনোযোগ অন্তর্মুখী থাকলে যা হয়।

কালিদাসদা (মজুমদার)—আমরা জাগরণী গান গাওয়ার সময় যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের প্রণাম করেন, সেখানে কি আমরা সেই সময় প্রণাম করব, না তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে যাচ্ছি, সেই বোধে প্রণাম করবো না তখন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রণাম করাই ভাল। না করলে তার মধ্যে ego (অহং) থাকে। বিচারে হয়ত প্রণাম না-করাটা দাঁড়াতে পারে। কিন্তু তখন তখনই প্রণাম না করলে অভ্যাসের রকমটা ভেঙে যাবে, তা' ব্যাহত হবে। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে অভিবাদন করার যে ঝোঁক আছে—যে বৈশিষ্ট্যে আমরা পরিপুষ্ট—তা' নিরুদ্ধ হবে। ওতে আমরাই loser (ক্ষতিগ্রস্ত) হব।

আসাম থেকে জীবনদা নামে জনৈক দাদা এসেছেন। তিনি বললেন—আমার মনের দ্বিধা, সন্দেহ যে যায় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের দ্বিধা, সন্দেহ যদি থাকে, তার ফল হয় conflict (দ্বন্দ্ব)। এইটে ঠিক না ওইটে ঠিক, এইরকম একটা দ্বন্দ্ব জাগে মনে। কিন্তু একটা point (বিন্দু) আছে যেখানে মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে দাঁড়াতে পারে। সেটা হলো ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি ও প্রবোধনা। এমনতর সঙ্কল্প—যে, আমার শ্রেষ্ঠ

যিনি একমাত্র তাঁকেই পরিপূরণ করব আমার সবকিছু দিয়ে—তাই-ই আমার ধর্ম, তাই-ই আমার অর্থ, তাই-ই আমার কাম, তাই-ই আমার মোক্ষ—এক কথায়, চরম সার্থকতা। এই এমনতর একটা urge (আকুতি) যদি নিজের ভিতর সৃষ্টি করে ফেল যে, ঐ মাপকাঠিতে মেপে ছাড়া এক পা-ও চলবে না নিজের খেয়ালে, ঐটেই যখন হবে তৃপ্তির ও সুখের, তখন কাজের ভিতর দিয়ে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান হতে থাকবে। তখন কিছু আর foggy (ধোঁয়াটে) থাকবে না, clear (পরিষ্কার) হ'য়ে যাবে সবকিছু। ঐ তাঁকে পরিপূরণ করতে গেলে কিন্তু তাঁরই প্রীত্যর্থে পরিবেশকেও বিহিতভাবে সেবা করতে হবে।

জীবনদা—আমার মাঝে মাঝে সুবুদ্ধি আসে, মাঝে মাঝে দুর্বুদ্ধি জাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুবুদ্ধি-দুর্বুদ্ধির দ্বন্দ্ব থাকে, যতদিন oscillating (দোলায়মান) রকম থাকে।

জীবনদা—দ্বিধা যে কাটে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয় দ্বিধা কাটুক, না হয় না কাটুক। কিন্তু আমি তোমারই। এই আমার কিছু নেই, কেউ নেই তুমি ছাড়া। আমার নাম নেই, বাড়ি নেই, ঘর নেই, কেবল তুমি আছ। তাই তোমাকেই পরিপূরণ করব—ঝড়ের মত দুর্নিবার বেগে। এইভাবে determination (সংকল্প)-টা ঠিক হ'য়ে গেলে দুর্বুদ্ধি থাক আর যাই থাক তাতে তোমার কিছু করতে পারবে না। তুমি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে উঠবে ঐ টানের তোড়ে। তখন environment (পরিবেশ)-কে কেমন করে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করে, তাদের দিয়ে কি করাবে তাও ঠিক পাবে। চাল-চলনও তেমন হবে, যাতে মানুষের শ্রদ্ধা উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে তোমার প্রতি। মানুষের কাছে শ্রদ্ধার্হ না হ'লে কিছু করতে পারবে না তাদের। sex and hunger (কাম এবং ক্ষুধা) মানুষের life-এর (জীবনের) পোষণী হওয়া চাই। Life (জীবন) যদি না থাকে তবে sex and hunger (কাম এবং ক্ষুধা) কার? মরা মানুষের কোনও sex and hunger (কাম এবং ক্ষুধা) থাকে না। sex and hunger (কাম এবং ক্ষুধা) যদি life (জীবন)-কে নষ্ট করে, তবে তা' দাঁড়ায় কোথায়? তাই, sex and hunger (কাম এবং ক্ষুধা) তেমন ক'রে manipulate (পরিচালনা) করতে হবে যাতে সত্তার সম্বর্ধনা হয়। লোভও তেমনি। লোভ যদি জীবনকে মারে তখন লোভ উপভোগ করবে কে? লোভকে ছাড়তেও চাই না, বাড়তে দিতেও চাই না, ততটুকু লোভই চাই, যতটুকু পারিপার্শ্বিক আমার সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পরিপোষক হয়।

জীবনদা—আশীর্ব্বাদ করুন যাতে ইষ্টপ্রাণ হ'য়ে চলতে পারি জীবনপথে, বাধাবিঘ্নের মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।" সন্ন্যাসী-যতি হয়ে ওঠ—আমার কেউ ছিল না, নেইও, থাকবেও না, তবে করা লাগবে সব আমারই। থাকার জন্য এমনভাবে struggle (সংগ্রাম) করতে হবে যাতে নিজের এবং সবার সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে। আর সেই চলাটাই জীবনের সার্থকতা।

জীবনদা—কি করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে তপ করবে—নামধ্যান করবে—অন্ততঃ দুবার নামধ্যানে বসা লাগে—শোবার আগে এবং ভোরে উঠে। চেষ্টা করবে, যাতে চব্বিশ ঘণ্টা তোমার নাম চলে। নিত্য অন্নজল গ্রহণের পূর্বে নিয়মিতভাবে ইষ্টভৃতি করবে। আর যাজন করা লাগে। Doctrine (নীতি)গুলি মানুষের উপযোগী করে পরিবেশন করে দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়ান লাগে। মানুষকে দীক্ষিত ক'রে তুললে তাদের sentiment (ভাবানুকম্পিতা)-টা nurtured (পরিপোষিত) হবে। তারা সত্যি সত্যি adhered (অনুরক্ত) হবে, integrated (সংহত) ও consolidated (ঐক্যবদ্ধ) হবে তখন তারাই তোমার সম্পদ। নচেৎ আজ আছে কাল নেই। মুসোলিনীকে একদিন যারা অত মানত তারাই তাকে খতম করে দিল। প্রবৃত্তি-প্রলোভনের কথা মানুষের সত্তাকে হীন করে, ক্ষীণ করে। তা' তাদের সম্বর্দ্ধিত করে না, তাদের being (সত্তা) ওতে exalted (উন্নীত) হ'য়ে ওঠে না।

ধনিক, শ্রমিকের প্রসঙ্গ উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই ধনিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব তুলে দাও। গার্হস্থ্য-যন্ত্র প্রবর্তন করে। মহাযন্ত্রের কাজ যথাসম্ভব গার্হস্থ্যযন্ত্রের মাধ্যমে এমনভাবে করতে চেষ্টা কর যাতে পারিবারিক পরিবেশে প্রত্যেকে উপচয়ী কর্ম্মে নিয়োজিত হ'তে পারে। প্রত্যেকের শ্রমশক্তি যেন আদর্শের পরিপূরণে ব্যয়িত হয়। ইষ্টস্বার্থ স্বার্থান্বিত হ'য়ে মানুষ যদি পরিবেশের সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সেবায় মেতে ওঠে তখনই হয় তার প্রকৃত অভ্যুদয়—এবং তা' সব দিক দিয়ে। প্রত্যেকটি শ্রমিকই তখন তার যোগ্যতা-অনুযায়ী মালিক হ'য়ে ওঠে। এই ধর্ম-কৃষ্টি-সমন্বিত জীবন জাগিয়ে তোল দেশের বুকে। তখন দেখ ব্যাপারটা কি হয়।

জীবনদা—কেমন ক'রে এটা সম্ভব হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাই যজনসমন্বিত যাজন। দেশের মধ্যে দেবত্বকে জাগাতে

গেলে আগে তোমার নিজের ভিতর দেবত্ব জাগাতে হবে। তোমার দেবোপম চরিত্র ও যাজনই হবে অপরের দেবত্ব—দীপনী ইন্ধন। মানুষ ও টাকা তেমনভাবে adjust (বিন্যাস) করতে পারলে গ্লানি এমনভাবে দূর করা যায় যাতে বৈশিষ্ট্য-মাফিক উন্নতির পথ প্রশস্ত ও ত্বরান্বিত হ'য়ে ওঠে। আর মানুষগুলিকে হাতেকলমে সব ব্যাপারে শিক্ষিত ও সুপটু ক'রে তোলবার জন্যে গ্রামে গ্রামে village professor অর্থাৎ গ্রাম্য অধ্যাপক বা আচার্য্য সৃষ্টি করা লাগে। তারা বাড়ি বাড়ি যেয়ে চেষ্টা করবে যাতে প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপচয়ী কর্ম্মে ব্রতী হয়। পুরুষ-মেয়ে কারও উৎপাদনী শ্রমশক্তি যাতে নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করতে হয়। প্রত্যেকে যদি লাভজনকভাবে কর্ম্মমুখর হ'য়ে ওঠে তাহ'লে অভাব ও দারিদ্র্য ছুটে পালাবার পথ পাবে না। মালক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হবে সারা দেশের ঘরে ঘরে।

জীবনদা—মানুষ কি শুনবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনবে কিনা সেটা আমাদের পরিবেশনের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেককে তার রুচির মধ্য দিয়ে অনুসরণ করে, দীক্ষিত করে যত মানুষকে integrated (সংহত) ক'রে তুলতে পারবে, তাই দিয়ে বোঝা যাবে তোমার কৃতিত্ব ও তপসিদ্ধি কতখানি। দেশের অধিকাংশ লোককে দীক্ষিত ক'রে তোলা লাগে। Admirer (গুণগ্রাহী) নয়—দীক্ষিতই করা লাগে। যদি শতকরা সত্তর ভাগ লোককে দীক্ষিত ক'রে তোলা যায়, তাহ'লে খোলাখুলিভাবে তখন তোমরা তাদের সহযোগিতায় যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে হাত দিতে পার, আবার চল্লিশ কোটির মধ্যে যদি তেমন এক কোটি leading agents (চালক ধরনের মানুষ) ঠিক ক'রে নিতে পারে, তারাও পারে, চল্লিশ কোটি কেন, আরও বেশি লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলতে।

জীবনদা—তাহ'লে জীবনবৃদ্ধিই হল প্রকৃত কম্যুনিজম্?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই-ই মূল জিনিস। এর উপর দাঁড়িয়েই শিক্ষা, কৃষ্টি, বর্ণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি যা কিছু কথা।

জীবনদা—"যার পয়সায় কেনা জমি সেই তো আসল ভুঁই-এর স্বামী"। 'জমিতে যার অধিকার ফসলে ভাগ আছেই তার'—ইত্যাদি উক্তির সুযোগ নিয়ে মানুষ তো অপরকে ঠকাতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জমি যে কেনে তার পেছনে তার কতখানি labour (শ্রম) থাকে। লোকটা জমিটুকু না কিনলে কৃষক ঐ জমি চাষ করার সুযোগই পেত না। তাই চাষী যদি নিজেই সব দাবী করে তবে জমির মালিকের উপর injustice (অবিচার) করা হয়, উৎসকেই নিকেশ করা হয়। আমরা মারতে চাই না যার

জমি তাকে। যাকে দিয়ে পেলাম, তাকে দিলাম না, সে বাঁচল না, তার মানে শেষ পর্য্যন্ত আমিও বাঁচলাম না। যার উপর দাঁড়িয়ে বাঁচতে যাচ্ছি, তাকেই যদি খতম করে দিই তাহ'লে তো আমার বাঁচার ভিতটাকেই নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়।

জীবনদা—'লাঙল যার জমি তার' এও তো একটা দিক আছে?

কেষ্টদা—গরুইতো লাঙল টানে, তাহ'লে গরুই পাবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—গরু, কিষাণ, মালিক সবাই বাঁচুক। যাদের দিয়ে পাই তাদের না দিলে আমার বাঁচাটা উচ্ছন্ন হ'য়ে যাবে।

কম্যুনিজম-এর কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কম্যুনিস্টরা কি কয় জানি না তবে আর্য্য-ভারতীয় সমাজতন্ত্র যা ছিল, তার মধ্যে গ্লানি যেগুলি ঢুকেছে, সেগুলি যদি দূর ক'রে ফেল, তবে প্রত্যেকেই বৈশিষ্ট্যমাফিক শ্রমের ভিতর দিয়ে automatically engaged (আপনা থেকে কর্ম্মব্যাপৃত) হ'য়ে উঠবে। তাতে কেউ বেকার থাকবে না এবং সব বর্ণই inter interested (পরস্পর স্বার্থান্বিত) হ'য়ে উঠবে। তখন গোটা সমাজটাই হবে যেন সর্বাবয়ব-যুক্ত পুরো মানুষ, যারা মাথা বিপ্র, বাহু ক্ষত্রিয়, পেট বৈশ্য, পদ শূদ্র। কোন অঙ্গ বাদ দিয়ে সমাজ দাঁড়াতে পারে বল? মাথাকে বাদ দিলে পা থাকবে না, পেট বাদ দিলে পা, মাথা, বাহু স্থবির হবে, বাহুকে বাদ দিলে খেতে পাব না এই তো ব্যাপার। এর মধ্যে বড়ছোটর কথা নয়। যে যতট fulfil (পরিপূরণ) করছে সে ততটা বড়। বৈশ্যরা আয় উপায় করে তো ক্ষত্রিয় শাসন চালায়, রক্ষণের দায়িত্ব নেয়, আবার বিপ্ররা উদ্ভাবনও পরিচালন করে, আর শূদ্র গায়-গতরে খাটে, সেবা করে। প্রত্যেকে যে কাজ করে সে তার instinctive organic adjustment (সহজাত বৈধানিক বিন্যাস) অনুযায়ী। প্রত্যেক বর্ণের উৎকর্ষ-সাধনই আমাদের লক্ষ্য। কারণ, সমাজের জন্য এদের প্রত্যেকেই অপরিহার্য্য। আগে নিয়ম ছিল আপদ্ধর্ম ছাড়া কেউ তার বৈশিষ্ট্যানুগ কর্ম্ম ছাড়া অন্য বর্ণের কর্ম্ম দিয়ে জীবিকা অর্জন করবে না। বিপ্র জুতো বানান শিখাতে পারবে, কিন্তু জীবিকা হিসাবে তা' গ্রহণ করতে পারবে না। বৃত্তি-অপহরণ ছিল পাপ। বিপ্রের যে অতখানি সম্মান ছিল, তার মূলে ছিল তাদের ত্যাগ-তপস্যা-পূত চরিত্র ও উন্নত ধরনের সেবা। আবার বলত—"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ"। অবশ্য ব্রাহ্মণ বলতে বুঝায় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে। প্রত্যেককেই ব্রাহ্মণ হওয়ার অধিকার দিয়েছে আমাদের শাস্ত্র। তা' কিন্তু সহজ বৈশিষ্ট্যসম্মত কর্ম্মের ভিতর দিয়ে। শূদ্রকেও ক্রমোন্নত ক'রে তুলতে হবে তার বিশিষ্ট রকমে, কারণ তাকে যদি হাতেকলমে না করিয়ে আগেই cosmic theory (বিশ্বজাগতিক তত্ত্ব) বোঝাতে যাই তবে তা' তার মাথাটার কর্ম্ম সারা। আর

আগে আমাদের ছিল biological structure (জৈব কাঠামো) ঠিক রাখার উপর জোর। তাই বিয়েথাওয়া এমনভাবে দেওয়া হতো যাতে স্বামী-স্ত্রী মনোগত ও দেহগত সঙ্গতির ভিতর দিয়ে সুসন্তানের জনক-জননী হ'তে পারে। তাই, প্রতিলোম ছিল না, কারণ প্রতিলোম বিধি-বিরুদ্ধ, বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। ওতে পরিধ্বংসেরই সৃষ্টি করে। বিহিত সবর্ণ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন ছিল। শুধু সবর্ণ ও অনুলোম হলেই হত না, প্রত্যেকটা বিয়ে যাতে সত্তাপোষণী ও বৈশিষ্ট্যবর্দ্ধনী হয়, সেইদিকে শ্যেন দৃষ্টি রাখা হতো।

রাশিয়ার কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাশিয়া দিয়েই বা কি করব, ইংল্যাণ্ড দিয়েই বা কি করব? আমরা যে এত খাই ভাত, ডাল তরিতরকারি, শাকসব্জী, ফলমূল ইত্যাদি, আমরা ঐসব বস্তুতে পরিণতি লাভ করবার জন্যে কিন্তু ওগুলি খাই না। খাই ওগুলি থেকে সত্তার পোষণ সংগ্রহ করতে, নিজ দেহকে বজায় রাখতে। রাশিয়াকে নিতে যেয়ে সত্তাটাকে যদি নষ্ট করে ফেললাম, তাহ'লে কি হল? আমরা নিজত্ব বজায় রেখে যে-কোন জিনিস প্রয়োজনমত নিতে পারি। কম্যুনিস্ট হ'লে যদি ভাল হয়, আমাদের সত্তা-সম্বর্দ্ধনা ও বৈশিষ্ট্য যদি পুষ্ট হয়, তবে লাখবার কম্যুনিস্ট হবো। আমরা মার্কস-কেও বাদ দিতে চাই না, যদি তিনি সত্তা-সম্বর্দ্ধনী বৈশিষ্ট্য-পোষণী হন। বৈশিষ্ট্য মানে—তদনুপাতিক organic adjustment (বৈধানিক বিন্যাস)। তার আবার group (গুচ্ছ) আছে। এইগুলিকেই বলা হয় বর্ণ, এর কোনটাই আমরা নষ্ট করতে চাই না। নষ্ট করা মানে যুগ যুগ ধরে, তিল তিল করে, যা গ'ড়ে উঠেছে তা' হারান। ন্যাংড়া আম আছে, ফজ্‌লি আম আছে আরও কত রকমের আম আছে। এর একটা জাত যদি নষ্ট ক'রে ফেলি তাহ'লে কিন্তু তা' আর ফিরে পাব না—হারাব চিরতরে। সেকি ভালো? ফজ্‌লি আমের মধ্যে তো ন্যাংড়া আমের স্বাদ পাব না। একটা বৈশিষ্ট্য নষ্ট করলে হাজার মাথা কুটেও তা' ফিরে পাব না। তাই যেন আমরা বুঝে চলি।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার যদি বৈশিষ্ট্য মাফিক সত্তা-সম্বর্দ্ধনী চলন না হয়, তাহ'লে হবে না। ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে সমষ্টি-উন্নয়ন হয় না। ব্যক্তিগুলি নিয়েই সমষ্টি আর প্রত্যেকটি ব্যক্তির সার্থকতা নিহিত ইষ্টানুগ বৈশিষ্ট্য-পরিপূরণী চলনে। প্রতেকটি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের যেখানে ইষ্টার্থীছন্দে পরিপূরিত হওয়ার ব্যবস্থা আছে—পারিপার্শ্বিকের সাথে সহযোগিতায়—সমন্বয়ে;—সেই বিধানই ঠিক।

State (রাষ্ট্র) হ'ল তাই, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ একটা কৃষ্টির উপর

দাঁড়িয়ে থাকে সবৈশিষ্ট্যে—সেবা, সংহতি, শক্তি, জীবন ও বৃদ্ধির ঐক্যতানে। যেমন আমাদের শরীর-বিধানে liver (যকৃত) —সে নিজের মত বাঁচে ও কাজ করে, তাতে আবার nurture (পোষণ) পায় আর সব organ (অঙ্গ) এবং সমস্ত শরীর। heart (হৃদপিণ্ড)-ও তেমনি কাজ করে independently in its own way (স্বাধীনভাবে তার নিজস্ব রকমে)। অথচ in co-operation with others (অন্য সবার সাথে সহযোগিতা নিয়ে) হার্ট গোলমাল হ'লে আবার লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই একটা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নষ্ট হ'লে তার পারিপার্শ্বিকও ততখানি loser হবে। আমরা equality (সমতা) বুঝি না, বুঝি equitability (বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিবেশন)। যার যা' লাগে তাকে তাই দাও—তার সত্তা-পোষণী ক'রে। আমি বুটি খেতে ভালবাসি বলে, সকলকে যদি জোর ক'রে বুটি খাওয়াতে চাই তা' কিন্তু ঠিক হবে না। জিনিসটা সাম্যবাদ অর্থাৎ equality in sympathy and feeling (সহানুভূতি এবং সংবেদনে সমতা)—প্রত্যেকের প্রয়োজনটা আমার মত ক'রে বোধ করে তার পরিপূরণ করা তার স্বস্তি এবং তৃপ্তির দিকে চেয়ে। সমস্বার্থী না হ'লে শুধু বুদ্ধি থেকে সববেদনা আসে না, প্রবৃত্তি-অনুপাতিক চিন্তা ও বোধ হয় এবং নিয়ন্ত্রণও করে তেমনি।

জীবনদা—আমার একমাত্র কামনা যাতে আমি যোগ্য হ'তে পারি আপনার কাজে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার সব চাইতে বড় কামনা—তুমি কর, পাও, হও ;—আর যোগ্যতা এর ভিতর দিয়েই।

বেলা অনেক হয়ে গেছে, যতি-আশ্রমে টিনের চালের বারান্দার নিচে এখন অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বেশ কষ্ট হ'চ্ছে। তাঁর পেলব দেহ থেকে টস্‌টস্‌ ক'রে ঘাম ঝরে পড়ছে। তবুও জীবনদার আগ্রহ দেখে তিনি অক্লান্তভাবে ও আনন্দে প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছেন।

জীবনদা—করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করণীয় ঐ যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। এই তিনটে জিনিস মানুষকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এতে আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের ভিতর একটা অসাধারণ শক্তি সংহত হ'তে থাকে, যা' কিনা আমাদের বিপদ-আপদে রক্ষা করে। যজন-যাজন হ'ল একটা এ্যারোপ্লেনের দুটি পাখা, আর ইষ্টভৃতি হ'ল motive force (চালক শক্তি)।

এইগুলি করবে আর প্রতিলোম-বিবাহ লৌহহস্তে বন্ধ করবে। উপযুক্ত পুরুষের বহুবিবাহ বন্ধ করা একটা sucidal (আত্মঘাতী) জিনিস। আমরা চাই এমনতর

মানুষ সৃষ্টি করতে, আমদানী করতে, যারা সমাজের সেবা করতে পারে, উৎকর্ষ আনতে পারে। উপযুক্ত পুরুষের বহুবিবাহ ছাড়া তা' সম্ভব নয়। বহুবিবাহ রুদ্ধ হ'লে বহু মেয়ের হয়তো বিয়ে হবে না। মেয়েগুলি ধীরে-ধীরে সমাজের বাইরে চলে যেতে থাকবে, কিম্বা হিন্দু সমাজের মধ্যেও প্রতিলোম বিয়ে হতে থাকবে। তাতে তার normal sentiment (স্বাভাবিক ভাবানুকম্পিতা) নষ্ট হওয়ায় সে undone হয়ে যাবে। আর প্রতিলোম বিয়ের ফলে পুরুষের structive (গঠন) গুণ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যও মাঠে মারা পড়বে। তার বৈশিষ্ট্যটারও একটা প্রয়োজন আছে দুনিয়ায়। দুনিয়া তা' হারাবে, আবার তার সন্তান হবে পরিধ্বংসী। তাকে দিয়ে জীবনবৃদ্ধি ও সংহতি বিধ্বস্ত হবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বহুবিবাহ সম্পর্কে বললেন—বহুবিবাহ যার তার জন্য নয়। অটুট কঠোর আদর্শে যে, বহুবিবাহে সমর্থ সে। আমাদের সমাজ বরাবর চেয়েছে নীচুকে উঁচু করতে। সেটা প্রজননের দিক দিয়ে, সাধনার মাধ্যমে এবং অনুলোম-ক্রমে সামাজিক সম্বন্ধ সৃষ্টি করে।

জীবনদা—টেস্ট-টিউব বেবী সম্বন্ধে আপনার কি মত? স্বামী-স্ত্রী হিসাবে মিলন না হয়েও তো সুপ্রজনন হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে দোষ আছে। ক্ষুধা থাকলে যেমন জিহ্বা থেকে হজমের উপযোগী রসক্ষরণ হয়, যাতে খাদ্য থেকে ভাল ক'রে পুষ্টি সংগ্রহ করা যায়, তেমনি স্ত্রীর সতীত্ব অর্থাৎ স্বামীর প্রতি সুকেন্দ্রিক টান থাকলে তার যৌন গ্রন্থি থেকে এমনতর ক্ষরণ নিঃসৃত হয় যা' থেকে বীজ-সত্তা ভাল পোষণ পায় এবং সন্তান তেজ বীর্য্যের অধিকারী হয়। লোভী মানুষ যারা তারা ক্ষুধায় খায় না, লোভে খায়। তাতে জীবনীয় রস ক্ষরণ হয় না, তাই খাদ্য শরীরের বিহিত পুষ্টির কারণ হয় না। স্বামীর উপর নারীর প্রাণের টান না থাকলে বা শুধুমাত্র কামাসক্তি থাকলে তার যৌনগ্রন্থি থেকে পোষণপ্রদ রস নিঃসরণ হয় না। তাই, সন্তানও দেহ, মন ও মস্তিষ্কের দিক দিয়ে যথাযথ পুষ্টি পায় না।

জীবনদা—আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আশীর্ব্বাদ হ'ল তোমার চলা।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সুললিত কণ্ঠে বললেন—'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং যৎ কৃপা তমহম্ বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।'—আমাকে দিয়েই বুঝতে পারি—আমার মত মূর্খ তো নেই, অথচ সহজভাবে যে সব বুঝতে পারি ও বলতে পারি সে একমাত্র তার দয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ভাবাবেশে দৃপ্ত কণ্ঠে প্রেরণা-প্রদীপ্ত

ভঙ্গীতে বললেন—চাই মানুষ-সংগ্রহ। দুনিয়াটাকে কাঁপিয়ে দিতে পারে এমনতর মানুষ। তারা হওয়া চাই সন্ন্যাসী মানুষ, যাঁরা কারও ভার হবে না, সানন্দে সবার ভার বহন ক'রে চলবে। সেই উঞ্ছবৃত্তিওয়ালা সন্ন্যাসী চাই।

তোমার ক্ষুদ্র মমত্ব এখনই ছেড়ে ফেল, সবদিক দিয়ে সর্বান্তঃকরণে, সর্ব্ববৃত্তি নিয়ে তাঁতে অনুরক্ত হও। আর তা' নিয়ে মানুষের সেবা কর। আর, সেবা মানে—পরিপোষণ, পরিপূরণ, পরিরক্ষণ। তুমি যদি মানুষের শ্রদ্ধার্হ হয়ে না ওঠ, মানুষের সত্যিকার সেবা করতে পারবে না। সত্যিকার সেবা মানে তাদের মধ্যে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা। আর সেটা সম্ভব, তোমার ইষ্টমুখী চলন-চরিত্র যদি তাদের অন্তরে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি
সংনৎস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।'

নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের মমতা ও প্রত্যাশাটা জ্বর। তা' ত্যাগ ক'রে তাঁর স্বার্থ-প্রতিষ্ঠায় লোকসংগ্রহার্থে কাজ কর। তাদের উদ্বুদ্ধ কর, বাঁচা-বাড়ার পথ দেখাও। তাদের মধ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপন কর—মানে তাদের যোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোল। তাই ধর্ম্মদানের চাইতে শ্রেষ্ঠ দান আর নেই। যাতে সপারিপার্শ্বিক নিজে বাঁচা-বাড়ায় দাঁড়াতে পারে, সেইটে impart (সঞ্চার) করাই ধর্ম্মদান।

আমি যোগীই হই, যতিই হই, আর যে ist (বাদী)-ই হই, আমাকে সদাচারী হওয়া লাগবে। সদাচার মানে যাতে বাঁচি, বাড়ি—actively (সক্রিয়ভাবে) তা' পরিপালন করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালিদাসদা, ননীদা প্রভৃতির দিকে চেয়ে বললেন—তোমরা এখন কিছুটা করছ ব'লে, কত চারিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের দেখে মানুষের ভরসা জাগছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তারপর জীবনদাকে বললেন—তোমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ যেন মানুষকে মুগ্ধ ক'রে তাকে প্রবুদ্ধ করে তোলে তোমার হৃদয় সিংহাসনে যে আদর্শ বসবাস করছেন তাঁকে অভিবাদন জানাতে, তাঁকে পূজা করতে। এক কথায় তোমাকে দেখেই যেন প্রত্যেকটি মানুষ তোমার আদর্শের ভক্ত হয়ে ওঠে।

জীবনদা—ভাল কাজে কৌশল যদি অবলম্বন করি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছলে, বলে, কৌশলে মানুষের প্রকৃত ভাল যাতে হয় তাই করতে হবে। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্'। যুক্ত না হ'লে কিন্তু কৌশল বেরোয় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কাজকর্ম্ম সম্পর্কে বললেন—মানুষের প্রবৃত্তির উসকানি

দিলে তাদেরও ক্ষতি করা হয়, নিজেরও ক্ষতি করা হয়। প্রলোভন দেখিয়ে যে নেতারা মানুষকে বাগিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা দুর্দ্দশায় পড়েই। কারণ ঐ তারা কোন মুহূর্ত্তে যে অন্যের প্রলোভনে প'ড়ে তার বিরুদ্ধে চলে যাবে, তার ঠিক নেই। কিন্তু সুকৌশলে যারা আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে, মানুষ তাদের permanent asset (স্থায়ী সম্পদ) হ'য়ে ওঠে।

গড্‌সে, হিটলার ইত্যাদির সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—দোবেজীকে কয়দিন দেখি না, উনি ভাল আছেন ত' ?

খগেন (মণ্ডল) বলল—উনি ভাল আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে আপনমনে বললেন—ব্যক্তিজীবনে ও সমষ্টিজীবনে শান্তি ও সামর্থ্য দুই-ই চাই। শান্তি ছাড়া সামর্থ্যের দাম নাই, সামর্থ্য ছাড়াও শান্তির দাম নাই। স্বতন্ত্র ব্যক্তিজীবন নষ্ট করা ভাল না, তাতে ব্যক্তির free will (স্বাধীন ইচ্ছা) থাকে না। তাই সে যা হওয়ার জন্য জন্মেছিল তা' আর হ'তে পারে না। তার বৈশিষ্ট্য দুমড়ে, মুচড়ে যায়, সে আর সে থাকে না। তার fine traits (সূক্ষ্ম গুণ) cultured (অনুশীলিত) হ'তে পারে না। আমি ইচ্ছা ক'রে ঘরে থাকা, আর জোর ক'রে আমাকে ঘরে আটকে রাখা—এ দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক—যদিও দুটোতেই আছে আবদ্ধ হ'য়ে থাকা। একটার পেছনে free will (স্বাধীন ইচ্ছা) আছে ব'লে নিজেকে নিজেই সেইভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করি, lovingly (প্রীতির সঙ্গে) থাকি, আনন্দ পাই, বেড়ে উঠি। আর একটায় জোর-জবরদস্তি আছে ব'লে, freedom (স্বাধীনতা) নেই ব'লে মনটা পীড়িত হয়, আমার ব্যক্তিত্ব অপমানিত হয়। প্রিয়ের কাজের জন্যে আমি যদি ঐভাবে স্বেচ্ছায় ব্যাপৃত রাখি নিজেকে সেটাও কিন্তু আমার আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির কারণ হ'য়ে ওঠে। Freedom মানে প্রীডম, অর্থাৎ প্রীতি নিয়ে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দে প্রিয়-নিকেতনে বাস করা। এর উল্টো হলেই সত্তা সঙ্কুচিত হয়। যেখানেই শান্তি সামর্থ্যকে কোলে ক'রে নিয়ে আসে, সেই-ই ঠিক ; অন্যথায় শান্তি ও সামর্থ্য দুই-ই খাপছাড়া হ'য়ে পড়ে। ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা যে বলছি, এর পেছনে একটা মস্ত কথা এই যে, আমি তা' করতে পারব না, যাতে পারিপার্শ্বিকের বাঁচা-বাড়া ও সুখ-সুবিধা ক্ষুন্ন হয়। বেচাল চলনকে সমাজ কখনও বরদাস্ত করে না। সমাজ-বিধান ও পারিপার্শ্বিক এমন হওয়া চাই, যাতে প্রত্যেকে স্বতঃই সৎ চলনে অভ্যস্ত ও প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে এবং উল্টো চলন নিরুদ্ধ হয়-ই কি হয়।

শেষ পর্যন্ত প্রকৃত বর্ণাশ্রমের আমি কোন বিকল্প দেখতে পাই না। গত

দু'হাজার বছর ধ'রে এত আঘাত খেয়েও যে বর্ণাশ্রম আজও ক্ষীণভাবে টিকে আছে, সে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। কি beautiful adjustment ও mechanism (সুন্দর বিধান ও মরকোচ) এর ! rightly adjusted (সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত) হ'লে কি কাণ্ডটাই হ'ত ! বর্ণাশ্রম একদিন ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের প্রায় গোটাটাই সুষ্ঠু, সমন্বয়ে নিয়ন্ত্রিত করত। কত বৈজ্ঞানিক সেই সমাজনীতি—যার উপর দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র চলত নিরাবিল ভাবে—দ্বন্দ্ব, বিরোধ, বৈষম্যকে এড়িয়ে—প্রত্যেকটি সত্তাকে সার্থক ক'রে সহযোগী স্বাতন্ত্র্যময় জীবনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে একটু থামলেন, তারপর হঠাৎ বললেন—তখনকার দিনে একটা মেয়ে টেনে নেওয়ার উপায় ছিল ? সমাজের ছিল কঠোর শাসন, আর এই সমাজ কিন্তু সব বর্ণ ও শ্রেণী নিয়ে। তারা সমবেত চেষ্টায় দেখত যাতে কেউ কৃষ্টিবিরোধী চলনায় চলতে না পারে।

আগে কত কি শক, হূণ এসেছিল। তারা সবাই কিন্তু এই সমাজদেহের বিষ্ণুশরীরে লীন হ'য়ে আছে। আমাদের সমাজ জানত কেমন ক'রে সবাইকে আপন ক'রে নিতে হয়।

জীবনদা—কি কি করব এখন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যাব আদর্শের দিকে পরিবেশকে নিয়ে। সবর্ণ বিবাহগুলি বিহিতভাবে চালাব, অনুলোম বিবাহকে উৎসাহ দেব, প্রতিলোম নিরস্ত করব। Labour capitalist problem (ধনিক-শ্রমিক সমস্যা) রাখব না। সবাই তার মত ক'রে যাতে capitalist (মূলধনওয়ালা) হয়, তেমনভাবে প্রত্যেকের labour (শ্রম) adjust (নিয়ন্ত্রণ) করব। একজন capitalist (ধনিক) হবে আর সবাইকে সে slave (দাস)-এর মত ক'রে রাখবে, বর্ণাশ্রমের মধ্যে এই মনুষ্যত্ব অপলাপী ব্যবস্থার প্রশ্রয় ছিল না।

আজকাল দরিদ্রনারায়ণ কথা খুব চালু হয়েছে, ওকথা আমার ভাল লাগে না। নারায়ণ-ই যদি বলি, নারায়ণকে দরিদ্র থাকতে দেব কেন ?

জীবনদা—সময় লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের দেশের নেতারাই বরং পেছিয়ে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি সোজায় করতে যেয়ে সময়ও লেগেছে আবার পৈতে জড়া পাকানর মত সমস্যা জটিল হ'য়ে উঠেছে। এখন মানুষ পথ পাচ্ছে না, হাতড়াচ্ছে। করলে এখনই হবে, এই-ই সময়। যতটুকু করব ততটুকু হবে। যত বেগে করব তত তাড়াতাড়ি হবে।

জীবনদা—যেন পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারাই লাগবে। যেন আবার কি ?

শক্তি দিও করতে পারি
তোমার সেবা বর্দ্ধনা,
কর্ম্মহারা এ প্রার্থনায়
লুকিয়ে আছে পারবে না।

চরিত্রটা এমন করা লাগবে—কথায়, ব্যবহারে, চলনে যে, আমি তো তৃপ্ত হবই, আর ঐ আলোকে আশপাশের সকলে তৃপ্ত হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওঠার আগে প্রাণের সবখানি আবেগ ঢেলে দিয়ে দিব্যদ্যোতনায়, উদাত্ত ভঙ্গীতে হাতখানি প্রসারিত ক'রে বললেন—

পেয়েছি সত্য লভিয়াছি পথ
সরিয়া দাঁড়াক সকল জগৎ—
নাহি তার কাছে জীবন মরণ—
নাহি নাহি আর কিছু।

দীর্ঘসময় ধরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণমাতান কথা শুনে সবার প্রাণে এখন দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে অপার্থিব প্রেরণার প্রদীপ্ত শ্বেত-শিখা।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে ভূপেনদা (চক্রবর্ত্তী)-র সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলছিলেন।

ভূপেনদা বললেন—এতদিন বহু শক্তি নষ্ট করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' গেছে তা' গেছে। যা আবাহন করছ তাকে মূর্ত্ত ক'রে তোল।

ভূপেনদা—অনেক অকর্ম্ম, কুকর্ম্ম করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা হইছে তুলে ফেলে দাও। ঐসব হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যাক। সঙ্কল্প কর—আর কখনও প্রবৃত্তির ফাঁদে পড়ব না। চল ও কর তেমনি করে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে নিম্নলিখিত আশীর্ব্বাণী দিলেন—

তোমাদের প্রচেষ্টা সুন্দর,
অধ্যবসায় আনন্দের,
প্রার্থনা আমার তাঁর কাছে—
তোমরা সানরাইজ কেমিক্যাল
এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড নামে
যে যৌথ কারবার আরম্ভ করেছ,
লোকসেবার ভিতর দিয়ে
তা' সম্বর্দ্ধনায় সার্থক হ'য়ে উঠুক
আর সেই সার্থকতা যেন
শুভমণ্ডিত ক'রে তোলে

এই আর্য্যকৃষ্টিকে
যা'-কিছু সব তোমার ও তোমাদের,
সবই যেন
অর্ঘ্য হ'য়ে ওঠে
তাঁরই পূজার,
আর এই দীন আমার
ক্ষীণ হৃদয়ের
আবেগ ভরা আন্তরিক নিবেদন
তাঁরই যেন নৈবেদ্য হ'য়ে ওঠে।

তোমাদেরই—
৬ই বৈশাখ, ১৩৫৬ **দীন শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী**

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রি পৌনে দশটার সময় একটি বাণী দেওয়ার পর যতিদের বললেন—অতীতকালে কি কি করা উচিত ছিল, করেন নি কি, কেন করেন নি, কি-দোষ করেছেন সবটা ভেবে বিশ্লেষণ করে, সে সব যদি সমন্বয়ে নিয়ন্ত্রণ না করেন—বর্ত্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রেখে,—তাহ'লে ওগুলি আলাদা হ'য়ে subconscious state-এ (অবচেতন স্তরে) চলে যাবে। একটা বিচ্ছিন্ন অসমাহিত মানসিক ভাবরূপে থেকে, তা' কবে কি ভাবে ঢু মেরে যে তোমাকে পাড়ু ক'রে ফেলবে, তার ঠিক নেইকো। ঐ সব ব্যাপার সাক্ষাৎকার ক'রে নিয়ন্ত্রণ বা বিহিত স্থানে খ্যাপন করলে, অনেকখানি রেহাই মেলে।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—কাউকে হয়ত মোক্তারী করার সময় ফাঁকি দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা make up (পরিপূরণ) করতে চেষ্টা করা লাগে। তাকে যতটা fulfil (পরিপূরণ) করা যায়, দেখতে হয়, আর নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয় যথাযথভাবে।

রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় একটা বাণী দেওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার যা' জানা আছে, তা' বই দেখে জানা নয়। বইটই প'ড়ে একাজ করার জো ছিল না।

আত্মবিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে বললেন—নিজেকে যত দেখবেন—তত বুঝতে পারবেন—মন কত ফাঁকি দিয়েছে, আর যত নিজেকে দেখা থাকবে—খুঁটিনাটি করে,—ততই একটা মানুষের সামান্য চালচলন দেখে এমন ক'রে কথা কইতে পারবেন যে, সে একেবারে হতভম্ব হ'য়ে যাবে—এই ভেবে যে, কেমন ক'রে আমার সব কথা

এমন ক'রে জানল। নিজেকে দেখা যত গভীর ও পূর্ণাঙ্গ হবে, ততই সব আপসে আপ জানা হ'য়ে যাবে। জীবনে যা' কিছু করলাম, যা' কিছু কইলাম, সবতো নিজেকে দেখার ওপর দাঁড়িয়ে। যতই যা বলি, যতই যা করি আমার কোন কিছুর উপর আধিপত্য নেই। যখন কই তখন টের পাই না যে নিজে কচ্ছি—দেখি এই যন্ত্রটা কয়ে যাচ্ছে।

খ্যাপন শোনা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কারও দোষের কথা শুনে, তার সম্বন্ধে একটা ধারণার বশবর্ত্তী হওয়া ভাল নয়।

৭ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৫৬ (ইং ২০।৪।৪৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপস্থিত। যতিবৃন্দ ও চুনীদা (রায়চৌধুরী) কাছে আছেন।

কথায় কথায় লেখার কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদাকে বললেন—লেখার অভ্যাসটা বজায় রাখবি। উপন্যাস, ছোটগল্প, সমালোচনা সব রকমই লিখবি—লোকমঙ্গল অর্থাৎ ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে মুখ্য করে।

শরৎ চ্যাটার্জ্জীর লেখার ভাষায় একটা লালিত্য ছিল, একটা সূক্ষ্ম যৌন আবেগ ও মাধুর্য্যও ছিল, সে এক রকমের জিনিস। তোমরা লিখলে অন্য জিনিস হবে। তপস্যা করো আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ করো নিরখ-পরখ করো, ওর মধ্যে দিয়ে বহু কিছু গজিয়ে উঠবে, অন্তরের অন্তর্নিহিত জ্ঞান ফুটে উঠবে। ভাষার ভিতর দিয়ে তা' বেরোলে মানুষ মুগ্ধ হ'য়ে যাবে।

নামধ্যান খুব করতে হয়। নিজের মধ্যে যে ভালমন্দ কত কি আছে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সাধনায় তলিয়ে যেয়ে ভিতরের গুপ্ত নানাভাব চেতনায় ভাসিয়ে তুলে যত adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা যায় ততই ভাল। অনেক সময় বহু খারাপ জিনিসকে আমরা জেনেশুনে যুক্তিবিচারের সাহায্যে সমর্থন করি। যাদের কলমের জোর আছে এবং সেই শক্তির সাহায্যে যারা প্রবৃত্তির পঙ্কিলতাকে শোভন ও সুন্দর ধাঁজে, মুখরোচক করে পরিবেশন করে, তারা কিন্তু ভগবৎ-প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে এবং এইভাবে প্রকারান্তরে সমাজের ক্ষতি করে। কোন কিছু লেখায় দোষ নাই, যদি তার বাস্তব স্বরূপটি যথাযথভাবে তুলে ধরার ক্ষমতা থাকে। অনেক বেতাল জিনিস আবার অনেক সময় নিজের কাছেও ধরা পড়েনা। ভিতরে ডুবুরী নামিয়ে সে সব ধরতে হয়। অজ্ঞতা কোন গুণ নয়। যে লিখবে তার কলম

ধরার আগে নিজেকে এমনভাবে তৈরী করতে হবে, লেখার ভিতর দিয়ে যাতে অমঙ্গলের আবাহন করা না হয়। ক্ষতি করা সোজা, কিন্তু ভাল করা কঠিন।

জনৈক দাদা তার পারিবারিক জীবনের নানা অসামঞ্জস্যের কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে শায়েস্তা না হ'লে উপায় নেই। অপরের দোষ না দেখে, অপরকে দোষ না দিয়ে দেখতে হয় নিজের দোষ কোথায়। অবশ্য তোমার পারিবারিক পরিস্থিতির কথা যা বললে, তাতে তাদের দোষই বেশী বলে মনে হয়। এতে ওরা নিজেরাই নিজেদের কষ্ট ডেকে আনবে। কিন্তু ওদের উপরে তোমার ত' কোন হাত নেই, তাই ওদের তুমি কোন সদুপদেশ দিতে গেলেও ওরা তা' গ্রহণ করতে পারবে না। বরং তোমার কথিত সৎ-নীতি সম্বন্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবে। তাই সে চেষ্টা ছেড়ে দাও, বরং নিজের কাছে নিজে আরও পবিত্র হও। নামধ্যান, আত্মবিশ্লেষণ কর। সদাচারে চল। এমনভাবে চল যে তাদের তোমাকে শ্রদ্ধা না ক'রে গত্যন্তর থাকবে না।

উক্ত দাদা—বহু খারাপ মানুষের পরস্পরের মধ্যেও ত' বেশ ভাব দেখা যায়, অথচ আমি পরিবারের লোকদের যতই ভাল করি না কেন, তারা আমার শুভ প্রচেষ্টাকে দুর্ব্বলতা বলে মনে করে। এ ব্যাপারটা কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তির সাথে প্রবৃত্তির পিরিত হয় না। আমি হয়ত কাম বশে একটা মেয়েমানুষ বাগিয়ে আনলাম, ক্ষণিক পিরিতও হল, কিছুদিন পরে দেখা যাবে যে আমাকে দিয়ে যখন তার অফুরন্ত চাহিদার পূরণ হচ্ছে না, তখন সে পিরিত ছুটে গেছে। টাকার জন্য দু'জন জোট বাঁধলাম, ক'দিন যেতে না যেতেই দেখা যাবে—পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখাদেখি নেই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সত্তার সাথে সত্তার পিরিত না হয় ততসময় পর্য্যন্ত পিরিত জিনিসটাই হয় না। পরস্পর পরস্পরকে স্ব স্ব বৃত্তিস্বার্থে পূরণের জন্য শোষণ করতে কসুর করে না। মায়ের যে সন্তানের প্রতি টান, তা' কিন্তু টলে না কোন অবস্থাতেই। কিন্তু ঐ সন্তানের যদি মায়ের উপর টান না হয়, তাতে কিন্তু ঐ মায়ের লাখো করায়ও সন্তানের প্রকৃত মঙ্গল হয় না, অথচ মায়ের জানের উপর দিয়ে উঠে যায়।

উক্ত দাদা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বললেন—কি আর করবা কালিদাস! এইবার ভাল ক'রে তামুক সাজ। দেখতেছ ত' দুনিয়ার কাণ্ড। অসুখ-বিসুখ, অশান্তি জ্বালাযন্ত্রণা—এইসব ছাড়া ভাল কথা বড় একটা শোনা যায় না। তাই যতিমানুষ! এসবের হাত থেকে নিজেও বাঁচ। অন্যকেও বাঁচাও।

সুরেনদা—কেষ্টদা আমাকে গীতা মুখস্থ করতে বলেছিলেন, প্রায় পনের আনা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশী হ'য়ে বললেন—খুব ভাল। গীতা পড়ে আবার তা' apply (প্রয়োগ) করা লাগে সপারিপার্শ্বিক নিজের জীবনে। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এই দুইদিক বজায় না রাখলে হয় না। গীতার শিক্ষাকে কাজে ফলিয়ে তোলা লাগে। এই বয়সে যে মুখস্থ করছ এ অসম্ভব কাণ্ড। আমি ত' পারতাম না। এতে তোমার ছেলেপেলেদেরও ভাল হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে গাইলেন—

দূর হতে ভাল
নিকটে তরঙ্গ
দূরে রজত রেখা।

জীবন সমুদ্রের তরঙ্গের মধ্যে পড়ে কে কতখানি অবিক্ষুব্ধ থাকতে পারে—আবদ্ধ না হ'য়ে,—সেইটাই বড় কথা। নিরখ-পরখের ভিতর দিয়ে সর্ব্বদা অবস্থার ঊর্ধ্বে থাকতে হয়। এর মধ্যে আবার করণীয় করে যেতে হয়—ইষ্টের প্রীত্যর্থে। তৃষ্ণার নিবৃত্তি এমনি করেই আসে। তখন বলা চলে—হে গৃহকারক! আমি তোমাকে দেখিয়াছি, আমাকে দিয়া আর গৃহ রচনা করিতে পারিবে না।

খুব নামধ্যানের সময় অনেক সময় যৌন উত্তেজনা আসে। ফাঁসির মুহূর্ত্তেও হয়ত দেখা যায়—বীর্য্যপাত হ'য়ে গেল। কোনও প্রবৃত্তিকে নিশ্চিহ্ন করা ঠিক না কিন্তু প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিকে এমন করে জয় করতে হয় যাতে তা অজান্তে টেনে নামাতে না পারে। কামটা আদি রস কিনা, তাই ওটা স্বভাবতই মানুষকে নীচের দিকে টানে। ওটা sublimate (ভূমায়িত) করতে পারলে অনেক বাঁচোয়া।

শরৎদা—উদ্বেগের সময় অনেকের কাম-প্রবৃত্তি জাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবন যখন বিপন্ন হয়, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তখন মেয়েমানুষ স্বামীকে খোঁজে, স্বামী স্ত্রীকে খোঁজে। সন্তানরূপে transformed (পরিবর্ত্তিত) হ'য়ে তার ভিতর দিয়ে বাঁচতে চায়। সত্তার বিনাশ কেউ চায় না। দেহ বিনষ্ট হবে এই ভয়ে সন্তান সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বাঁচতে চায়। আমি এইরকম ভাবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—আমার মনে হয় শ্রাদ্ধের অন্ন কিম্বা বিশেষ সঙ্কল্প প্রসূত শ্রাদ্ধের দান যথাসম্ভব গ্রহণ না করাই ভাল।

চুনীদা—প্রবৃত্তির suppression (অবদমন) এবং sublimation (ভূমায়িত-করণ)—এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তিগুলি যখন আমাদের উপর প্রভুত্ব করে তখন আমরা সেগুলির দাস হ'য়ে থাকি। হয়ত লোকভয়ে কোন প্রবৃত্তিকে চেপে রাখলাম

তাতে সেগুলির জীবনীশক্তি কিন্তু হ্রাস পায় না। হয়ত বা নানরকম জটিল ধাঁজ নিয়ে অবচেতন বা অচেতন মনে ঢুকে বসে থাকে এবং সেখান থেকে নানাভাবে ধাক্কা মারতে থাকে। আবার প্রবৃত্তিগুলিকে হয়ত যথেচ্ছ প্রশ্রয় দিলাম, প্রশ্রয় দিয়েও আশ মিটল না, প্রবৃত্তিলোলুপতা প্রবলভাবে রয়ে গেল, কিন্তু শরীর মন ও পরিস্থিতি সেগুলি প্রকাশ্যভাবে উপভোগ করার সুযোগ দিল না। সেটাও কিন্তু নানাভাবে নানা বাসনা রূপে মনের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকল। নানা সাধু pose (ভাঁওতা) নিয়ে লোকমঙ্গলের ধুয়ো ধরে কত কৃত্রিম কায়দা-করণে অভিব্যক্তি লাভ করতে থাকল। এইরকম যে সব কায়দা-করণ, সে সবই suppression-এর (অবদমনের) এক এক নমুনা। কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তির এলাকার বাইরে, প্রবৃত্তিজয়ী কোন মানুষকে যদি আমরা জীবনের যথাসর্ব্বস্ব বলে অবলম্বন করি সমগ্র সুরতের সম্বেগ নিয়ে—তখন কিন্তু সবগুলি প্রবৃত্তি তাঁকে fulfil (পরিপূরণ) করবার জন্য তন্মুখী হ'য়ে ছুটল। এমনতর হওয়ার ফলে সেগুলি কেন্দ্রায়িত হয়। প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি অন্যসব প্রবৃত্তির এবং সেই সঙ্গে সত্তার পরিপূরক হয়ে কেন্দ্রায়িত হয়। তারপরে আসে তাদের meaningful adjustment ও sublimation (সার্থক নিয়ন্ত্রণ ও ভূমায়িতি)।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—ভাবা, বলা, করার সঙ্গতির ভিতর দিয়ে প্রবৃত্তির দাসত্ব অতিক্রম করতে না পারলে ত' suppression (অবদমন)-এর হাত থেকে রেহাই নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টে টান ছাড়া কোনও পথও নেই। আকাশের আকারে libido (সুরত) attracted (আকৃষ্ট) হ'তে পারে না। ইষ্ট যদি না থাকেন কিম্বা তদগতচিত্ত ভক্ত যদি না থাকেন—যিনি মন-প্রাণ ইষ্টের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন এবং নিজের ইষ্টপূরণী নেশা যদি প্রবল না হয় তাহ'লে, মানুষের এই প্রবৃত্তি-সঙ্কুল ভবসমুদ্রে সুস্থ মন-প্রাণ নিয়ে বাঁচাই কঠিন। বাতাস এত প্রয়োজনীয় জিনিস, তা' না হ'লে এক মুহূর্ত্তও বাঁচা যায় না, তবু সে বাতাসের উপর libido (সুরত) attractive (আকৃষ্ট) হ'তে পারে না। প্রবৃত্তির হাত থেকে রেহাই পেতে হ'লে উপযুক্ত মানুষে টান চাই-ই কি চাই। আবার রামকৃষ্ণদেবের যেমন কালীর উপর মন ন্যস্ত হয়েছিল—গুরুর প্রতি ভক্তি ভালবাসাকে আশ্রয় করে,—তাহ'লেও হয়। ভগবানের উপর নাড়ছেঁড়া টান চাই। কিন্তু বাসুদেবরূপী ভগবানকে পেলে মানুষের চলাটা সহজ হয়। গীতায় আছে—

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাংপ্রপদ্যতে।
বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

কিরণদা (মুখার্জ্জী)—প্রবৃত্তিগুলি ত' উপেক্ষা করা লাগে। তাতে কি suppression (অবদমন) হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তির ঝোঁককে চাপা না দিয়ে সেটাকে যদি সৎ-এর দিকে সক্রিয়ভাবে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে suppression (অবদমন) হয় না।

প্রফুল্ল—একেই কি বলে প্রত্যাহার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যাহারের জন্য প্রত্যাহার হয় না। প্রত্যাহার মানে প্রবৃত্তিকে তাচ্ছিল্য করে, তার প্রতি নেশাকে প্রশ্রয় না দিয়ে অন্যথা শুভ কর্ম্মে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা।

কেষ্টদা—গুরুজনের কাছে বা গুরুর কাছে অনুতপ্ত হ'য়ে দোষ স্বীকার করলে, তাতে মানসিক স্বস্তি পাওয়া যায় ত' ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে হয়, তবে আমি যা বলেছি—একদল সমতপা ভক্ত পরস্পর একযোগে ঘষা-মাজা ও বোঝাপড়ার ভিতর দিয়ে যদি প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে থেকে ইষ্টের মনোজ্ঞ চলনে চলতে বদ্ধপরিকর হয়, তাতে কাজ ভাল হয়।

কিরণদা—আপনার কাজগুলি ত' একলা কারও পক্ষে করা সম্ভব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার মন মেতে ওঠে সে একলাই করে—আর সবাইকে ইষ্টে স্বার্থান্বিত ক'রে তুলে। দীপঙ্কর ষাট বছর বয়সে তিব্বত, চীন সমস্ত জায়গায় গিয়ে একক কি করল। কত বই লিখল, কত লোক initiated (দীক্ষিত) করল। সে নিজে দায়িত্ব নিয়ে লোকসংগ্রহ ক'রে যা করার করেছিল—তার উদ্দেশ্যের পরিপূরণে। সমস্ত দায়িত্বটাকে যে একমাত্র নিজের করণীয় বলে মাথায় নিয়ে নামে, সে একাই পারে এবং করে—যা' যা' করার তা' করার জন্য সবকিছু লওয়াজিমা সংগ্রহ করে। ভক্ত কখনও না পারার অজুহাত দিয়ে খুশী থাকে না। যমও তার সামনে হাজির হ'তে ভয় পায়। তার পরাক্রমের জেল্লা দেখে শয়তানের অন্তরাত্মাও ভয়ে কাঁপে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ ও ভূপেনদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি আছেন।

ভূপেনদা একজনের সম্বন্ধে বললেন—তিনি বিশ্বাস করেন না যে মানুষ ভগবান হ'তে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান সম্বন্ধে একটা misconception (ভুল ধারণা) আছে। ভগবান বলতেই বুঝায় ষড়ৈশ্বর্য্যশালী মানুষ। ভগবান মনু কয়, ভগবান ব্যাস কয়। ভগবান কথার মানে Lord (প্রভু)—যেমন লর্ড ক্রাইস্ট।

আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদির মধ্যে আছে নিরাকার sense (ভাব)। আর গীতায় ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার পরমাত্মা-ভাবে।

শরৎদা—আপনি বলেছেন—প্রীতি-উন্মাদনার উৎসৃজনী যা', তাতেই খুশী থেক—তাহ'লে চাওয়া ত' উচিত নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাইতেও দোষ নেই—যদি কিনা প্রীতি-উন্মাদনা সৃষ্টি হয় এবং প্রীতি-উন্মাদনা থেকে দেয়। যেমন ক'রে হোক ওইটে হওয়া চাই। অবশ্য কিছু পাবেন না, তার জন্য প্রস্তুত হওয়াই ভাল। প্রত্যাশা রাখবেন না। তেমন-ভাবে চলতে পারলে না চাইতেই পাবেন, অবশ্য সে-লোভ থাকা ভাল না। আমি এক সাধু দেখেছি, তাকে লোকে এত পয়সা দিত যে, পয়সার স্তূপ জমে যেত, সে তা' থেকে দৈনিক মাত্র পাঁচ আনা নিত, আর সব প'ড়ে থাকত। ওই দেখে হেম চৌধুরীর বাড়ির মঙ্গলা ব'লে একটি ছেলে কিছু বাগাবার লোভে তার খুব সেবা করতে লাগল। সাধুও তাকে খুব খেতে দিত। ক'দিন পরে সাধু চ'লে গেল, পয়সার জায়গায় পয়সা প'ড়ে থাকল।

শরৎদা—জনসাধারণের টাকা যদি হাতে থাকে, এবং তার যদি হিসাব দিতে না হয়, তার থেকে কিছু কিছু খরচ করার বুদ্ধি হয়। এ সম্বন্ধে কি করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকা ভাঙ্গার বুদ্ধিটা যে প্রবৃত্তির চাপে প'ড়ে করি, বুঝে নিয়ে চরিত্র থেকে তা' তুলে ফেললেই হয়। আবছা বুঝি যে খুব ঠিক কাজ করছি না, তবু করি। ওর স্বরূপটা বুঝে নিয়ে ছেড়ে দিলেই হয়। আমি একটা উদ্দেশ্যে টাকা সংগ্রহ করলে, তা' কখনও অন্যভাবে ব্যয় করতে পারি না। মনে বড় লাগে। সে টাকা দিয়ে আপাততঃ একটা কাজ সেরে পরে যে পুরিয়ে রাখব তাও করতে মন চায় না।

কাশীদা (রায়চৌধুরী)—এটা ত' আমাদের ডালভাত হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা ত' অনুশীলন করনি, অনুশীলন করলে তোমাদেরও ঐরকম হবে।

আগে আমি টাকা নিতামই না। আমি কম ছুঁতাম। এ ও নিত। এক সময় খুব অভাবের মধ্যে দিয়ে গেছে। কচুরিপাতার ঝোল আর মোটা আউশ চালের ভাত কতদিন চালিয়েছি। কখনও বা একটু মটরের ডাল আর ভাত খেয়েছি। মা টাকার জন্য এদিক-ওদিক ঘুরতেন। তখন কেমন লাগত। তখন লোকে টাকা দিলে কোছে নিয়ে মার কাছে যেয়ে ঝুপ ঝুপ ক'রে ঢেলে দিতাম। এতে একটা আত্মপ্রসাদ ছিল। বড়বৌকে কিছু দিতাম, আবার এর ওর প্রয়োজনে কিছু দিতাম।

কাশীদা—টাকা-পয়সার ব্যাপারে ঠকাবার বুদ্ধি ছিল না কিন্তু go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) অনেক হয়েছে এবং তা' দিতেও পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠকাবার বুদ্ধিই আছে, তা' সত্ত্বেও নিজেকে সাধু ব'লে ভেবেছ।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—মর্য্যাদা যত চাই, ঐ প্রবৃত্তি তত নাজেহাল করে। মর্য্যাদা না চাইলে তা' আপনা থেকে এসে জোটে।

কাশীদা—অনেক সময় খাটো হওয়ার ভয়ে নিজের দোষ নিজে স্বীকার করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতে বোঝা যায় যে তুমি খাটোই আছ এবং খাটোই থাকতে চাও। খাটো হ'য়ে চলার মায়াটা তোমাকে ছাড়তে চায় না।

মতিদা (চ্যাটার্জ্জী) আজও চা খেয়েছেন। সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অভ্যাস ছাড়া কঠিন কিছু নয়। নিজেকে যদি শাসন করতে না পারি বিহিতভাবে, তাহ'লে ধর্ম্মের মঞ্চে দাঁড়ান ভাল না। তাতে এই পবিত্র মঞ্চটাই নষ্ট হ'য়ে যায়।

যতীনদা তামাক সাজতে যাচ্ছিলেন। খগেনদা (তপাদার) কলকে চাইলেন। যতীনদা দিতে যাচ্ছিলেন, সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুমি হয়ত আমার জন্য তামাক সাজতে যাচ্ছ তখন আর একজন হয়ত তোমার হাত থেকে কলকেটা নিতে চাইল, আর তুমি ছেড়ে দিলে, তা' কিন্তু ভাল না—তুমিই করবে। তখন বলতে হয়—আপনি পরে সাজবেন। যে-কাজ হাতে নেবে তা' নিজেই পুরোপুরি করবে বিহিত সময়ে। আর একজনের উপর মাঝপথে ছেড়ে দেবে না। ঐসব ছোটখাট ব্যাপারেও হুঁশিয়ার হ'তে হয়। ছোটখাট ব্যাপারই ব্যাপার। ওর থেকেই character (চরিত্র) moulded (নিয়ন্ত্রিত) হয়।

একটি বহিরাগত দাদা তার ব্যক্তিগত কয়েকটি কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতিদের লক্ষ্য ক'রে আবার বললেন—এখান থেকে বাইরে গেলেও মানুষের অনুরোধ-উপরোধে যেন আচার-নিয়মে এতটুকু deviation (ব্যতিক্রম) না হয়। কিছুতেই কোনমতেই yield (নতিস্বীকার) করবে না। কান্নাকাটি করলেও মেয়েদের সেবা বিশেষ নিতে যাবে না। আর নিজের কাজ নিজেই করবে—যথাসম্ভব অন্যের সাহায্য না নিয়ে।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—আপনাদের ঠাকুর তামাক-সুপুরি খান, এই অজুহাতে যেন আপনারা কেউ আবার তামাক-সুপুরি বা তজ্জাতীয় কিছু—যেমন পান, বিড়ি, চা ইত্যাদি চালাতে যাবেন না।

ভূপেনদা বললেন—অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে শুধু আপনার কাজ নিয়ে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ত' শুনলে ভালই লাগে মনে মনে, কিন্তু তোমার determination (সঙ্কল্প)-টা এমন হওয়া চাই যাতে দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশ, কর্ম্ম

তোমাকে কষ্ট দিতে না পারে। নিজেকে এমনতর চরিত্র দিয়ে সাজান লাগে এবং তা' আবার এতখানি ইষ্টানুরঞ্জিত হওয়া চাই, যাতে যেখানেই যাও সেখানকার মানুষ যেন তোমাকে দেখে তোমার ইষ্টকে কিছুটা বোধ করতে পারে। পরমপিতার জন্য নিজে পাগল না হ'লে, অন্যকে তাঁর জন্য পাগল ক'রে তোলা যায় না। ভেবে দেখ তুমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত কি না।

শরৎদা বললেন—মার্কস্-এর বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদে বলে—আগে বস্তু পরে মন। বস্তুই মন সৃষ্টি করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Mass (ভর)-টা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, শক্তি বস্তুতে দানা বাঁধে। বস্তুর প্রতিবিম্ব ইন্দ্রিয় ও স্নায়ু দিয়ে বাহিত হ'য়ে আমাদের মস্তিষ্কের উপর পড়ে। তা' ভাবের সৃষ্টি করে। ভাব আবার urge (আকূতি) সৃষ্টি করে। সেই আকূতি কাজে পরিণত হয়। কাজের উদ্দেশ্য থাকে প্রীতিকেন্দ্রকে প্রীত করা। মার্কস্ যা' বলেছেন সেদিক দিয়েও আদর্শকে ভালবেসে সক্রিয়ভাবে তাঁকে পূরণ ক'রে চলার কোন বাধা নেই। তাহ'লে ত' তাঁকে ধর্ম্মবিরোধী বলা চলে না। যেদিক দিয়েই যান, যেতে হবে ত' সপরিবেশ বাঁচাবাড়ার দিকে।

শরৎদা—আগে মন না আগে বস্তু ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে শক্তি। শক্তি যখন পদার্থে পরিণত হয় তার একটা অংশ চেতনার রূপ নেয়। যাকে বস্তু বলছি তা' কিন্তু চেতনাকে বাদ দিয়ে নয়। চিৎ-রূপ বস্তুর উপর অন্য বস্তু যখন তরঙ্গ তোলে তাকে কই মন, সে সাড়া দিতেও পারে, নিতেও পারে। আমি বুঝি বস্তু সচ্চিদানন্দকে বাদ দিয়ে নয়। বস্তুর পিছনে যে শক্তি এবং শক্তির রূপান্তর যে বস্তু তার mathematical equation (গাণিতিক সমীকরণ) করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকরা নাকি বলেছেন—E=mc2 ; যাকেই বস্তু কও তাই-ই অন্যভাবে শক্তি ও চিৎ, আবার যাকেই শক্তি ও চিৎ বল তা' সূক্ষ্ম বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়কো। নাম নিয়ে ঝকাঝকি ক'রে লাভ নেই। সৎ, চিৎ ও আনন্দ ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ হ'য়ে আছে এটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমার নির্দ্দেশমত যদি কেউ গবেষণা করে তবে তা' demonstrate (প্রদর্শন) করা অসম্ভব ব'লে মনে হয় না। তবে এটা যেভাবে যেখানে যতটুকু থাকবার সেখানে সেইভাবে ততটুকুই আছে, বোঝার মন থাকলেই বোঝা যায়।

কেষ্টদা—ভূমিতে শয়নের কি কোন বৈশিষ্ট্য আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যে নিয়ম পালন ক'রে যেভাবে ভূমিতে শয়ন করা চলে, তেমনতর করা সত্যিই healthy (স্বাস্থ্যকর)।